ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সংকলিত

শকুন্তলা

ও

সীতার বনবাস

ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, এম. এ., ডি. ফিল.

অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

লিখিত ভূমিকা

সান্যাল এণ্ড কোং

১/১এ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা ১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল, এম.এ., এলএল.বি.
১/১এ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা ১২

প্রথম সম্পাদিত সংস্করণ
২৫শে বৈশাখ ১৩৫৩

মুদ্রাকর :
শ্রীপঞ্চানন পাল
লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৬

মূল্য ছয় টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র জীবনবৃত্ত আবর্তিত হয়েছে প্রচণ্ড এক কর্মবেগে। সেই বেগে থেকে বিচ্ছুরিত বিবিধ আলোক কণিকার অন্যতম হচ্ছে এদেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার। এবং সদ্যজাগরিত সেই প্রায়ান্ধকারে শিক্ষা-প্রসারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন 'তরুণ গরুড় মম' 'মহৎক্ষুধা'র অনুভূতিতে অস্থির জনচিত্তের সামনে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ অভাব। তাই একান্তই প্রয়োজনের দাবী মেটাতে গিয়ে তিনি ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের স্বর্ণ ভাণ্ডারের দ্বারে ঋণপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতিই তাঁকে সাহায্য করলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার জন্ম লগ্নে এই সহায়তা পেয়ে সুপরিপুষ্ট হয়ে উঠলো। বিদ্যাসাগর ঋণ নিলেন বটে, কিন্তু তা বাঙালী পাঠক ও শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেবার আগে তার সঙ্গে কিছুটা নিজের হৃদয়ের আবেগ ও চেতনার রঙ মিশিয়ে দিলেন। আমরা ধার করা জিনিষের মধ্যে থেকেও পেলাম 'ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার জড়ানো এক অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত'।—

এই কারণেই আজও বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' বা 'সীতার বনবাস' পাঠের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। তাই আমরা ঐ বই দুটিকে একত্রে মুদ্রিত করলাম। বই দুটিকে এক সংগে সম্পাদিত করে প্রকাশ করবার পিছনে আরও একটা কারণ আছে। এই বই দুটির রচনার ব্যবধান মাত্র ছ-বছরের। এর মধ্যে বা আগে ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক এই ধরণের কোন কাহিনী-মুখ্য রচনা লেখেন নি। তাই রসাবেদনের দিক থেকে এই দুটি বই-এর মধ্যে একটি সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে এই ছ-বছরের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা-শৈলী ও ভাষা-প্রকাশের ক্ষেত্রে কতখানি বিবর্তন ঘটেছে তা-ও দুটি বইকে পাশাপাশি পেলে, সহজেই বোঝা যাবে।

এই দু-দিকেই লক্ষ্য রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ভূমিকাটি লিখেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার ভঙ্গী বিভিন্ন সংস্করণের তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি এবং সাবলীল রচনা স্বাভাবিক ভাবেই সংকলনটির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে।

পরিশেষে, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসনৎ কুমার মিত্র এই সংকলনটির পরিকল্পনা এবং সম্পাদনার কাজ করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আশাকরি, সংকলন গ্রন্থটি সর্বশ্রেণীর পাঠকদের পরিতোষ বিধান করতে পারবে। ইতি—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৩ প্রকাশক

ভূমিকা

ক ॥ বাঙলা গদ্যের ঐতিহ্য ও বিদ্যাসাগর

১.

বাঙলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই 'সচেতন' ভাবে বাঙলায় গদ্য রচনার চেষ্টা চলছিল, একথা ভুলে গেলে চলবে না। ইংরেজি শিক্ষার ফলে নাগরিক বাঙালীর যে মানসিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল সে পরিবর্তনে প্রতিক্রিয়া এসেছিল, আত্মরক্ষার চেষ্টা চলেছিল, ইংরেজিয়ানার মোহও এসেছিল। পরে সে মোহ কাটতে আরম্ভ করে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের সুচিন্তিত পরিকল্পনায়। পঞ্চাশ বছর ধ'রে (১৮০০-১৮৫০) এই প্রতিক্রিয়া, আত্মরক্ষা, মোহাবেশ, মোহভঙ্গ ও বাস্তব-বুদ্ধি-জাগরণের পর্ব চলেছে। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এই মোহভঙ্গের সূচনায়। তিনি মোহ-ভঙ্গে অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন, বাস্তববুদ্ধির প্রয়োগে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় জাতির মেরুদণ্ডকে সতেজ ও বলিষ্ঠ করবার প্রাণপণ সাধনা করেছিলেন। তাঁর সাধনা সংস্কারের সাধনা। সেই সাধনারই একটা দিক জাতির ভাষা-সাহিত্য সংস্কারের চেষ্টা। এই ভাষা-সাহিত্য সংস্কারের মূলে ছিল তাঁর জীবন-সংস্কারক ব্যক্তিত্ব।

বিদ্যাসাগরের আগে পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাঙলা গদ্যের যে চর্চা চলেছে সে চর্চাকে 'সচেতন' বলেছি এই জন্য যে, তার পিছনে ছিল একদিকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর শাসন যন্ত্রকে দৃঢ়ভিত্তি করবার চেষ্টা এবং অপরদিকে ছিল রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি কয়েকজন দেশহিতৈষীর স্বাধীন প্রচেষ্টা। এই সচেতন গদ্য চর্চার আগে অর্থাৎ উনিশ শতকের আগে বাঙলা গদ্যের ব্যবহার ছিল চিঠিপত্রে, দলিলে আর শিক্ষা

প্রয়োজনে। শিক্ষার প্রয়োজন বলতে বুঝতে হবে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায়, প্রশ্নোত্তরমালায়, আয়ুর্বেদ-জ্যোতিষ-স্মৃতি-ন্যায় ও কথকতা শিক্ষার্থীর সংক্ষিপ্ত ডায়ারি-জাতীয় রচনা। এই ধরণের রচনা ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকে বৈষ্ণব-বৈরাগী ও নাথ যোগীদের মধ্যে চলিত ছিল কিন্তু তাতে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া-যুক্ত সম্পূর্ণ গদ্যরীতির বাক্য-ব্যবহার ছিল খুব কম। ওই শতকের শেষে পোর্তুগীজ পাদরিরাও নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য প্রশ্নোত্তরময় কড়চা লিখতে থাকেন। এ তথ্য পাওয়া যায় ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুর থেকে ফ্রান্সিস্কো ফের্ণান্দেজের লেখা একটি চিঠি থেকে। পোর্তুগীজ পাদরিদের ছাপা বই যা পাওয়া গেছে তা মনোএল্ দা আসুম্প্সামের লেখা (১৭৪৩) এবং লিসবন থেকে রোমান হরফে ছাপা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'। এই প্রথম ছাপা বাঙলা বই (যতদূর জানা গেছে) সাধারণের জন্য লেখা নয়, নিজেদের ব্যবহারের জন্য লেখা। যারা পোর্তুগীজদের বল-প্রয়োগে বশীভূত হতো কিংবা যারা ছিল পোর্তুগীজ অসবর্ণ সন্তান এবং ক্রীতদাস তাদেরই শিক্ষার জন্য এই বই লেখা। অষ্টাদশ শতকের শেষ কয় বছর থেকে যে ইংরেজ পাদরিরা ধর্মপ্রচার করতো তাদের পদ্ধতি ছিল অন্য রকম। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সজাগ দৃষ্টি থাকার ফলে তাঁরা বল প্রয়োগ করতেন না, সাধ্যমতো বুঝিয়ে, উপকার ক'রে, বই লিখে ছাপিয়ে বিতরণ ক'রে খৃষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করতেন। তখন ছাপা বই-এর বিশেষ প্রচলন ছিল না ব'লে সাধারণের পরিচিত তুলট কাগজে পুরোনো ছাঁদে লেখা পুঁথি তৈরি করে তাতেই ধর্মপ্রচারের চেষ্টা চলতো। দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের আগে বাঙলা গদ্য চর্চার মধ্যে 'সচেতন সাহিত্যিক প্রচেষ্টা' ছিল না বললেই হয়।

এখন উনিশ শতকের উল্লিখিত পঞ্চাশ বছরের সচেতন গদ্য-চর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। তাতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা স্পষ্ট হবে, তাঁর নিজের কৃতিত্বকে স্পষ্টতর করে দেখতে পাবো।

২.

বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চার পূর্বে বাঙলা গদ্য যে লেখকগোষ্ঠীর হাতে পরিণতি পেতে চলেছিল সেই গোষ্ঠিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে পারি : ১। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগোষ্ঠী ; ২। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী ; ৩। রামমোহন রায়, প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির স্বাধীন প্রচেষ্টা।

এই তিন গোষ্ঠীর গদ্যচর্চা বাঙলা গদ্যসাহিত্যকে অনেকখানি পরিণতিমুখী করেছিল। এই গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে কিছু বলবার আগে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। সে দুটি হলো : মুদ্রাযন্ত্রের পরিবর্তন এবং সংবাদ-সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব। পদ্য অনেকখানি স্মৃতিনির্ভর, মুখে মুখে চলে। কিন্তু গদ্যকে স্থায়ী করতে না পারলে তা বিকৃত হবার সম্ভাবনাই বেশি। তাই গদ্য-সাহিত্য ছাপা হরফের মধ্য দিয়েই প্রসার লাভ করেছে—ছাপাখানার সমসাময়িক প্রবর্তনের ফলে। আর এই ছাপাখানার সুযোগ নিয়েই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) প্রথম সংবাদপত্রের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বে এই সাময়িকপত্রগুলি গদ্যের সরলীকরণে বিশেষ সাহায্য করেছিল, এবং ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অবতারণা ক'রে বাঙালীর মনীষা ও রচনাদক্ষতাকে উদ্বোধিত করেছিল। এ ছাড়া সমাজের উৎকেন্দ্রিকতার ব্যঙ্গচিত্র এঁকে বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রেরণা জুগিয়ে গদ্যকে সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগীও করতে পেরেছিল। বিদ্যাসাগরের আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামমোহন সাংবাদিকতার সূত্র ধরেই সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন এবং সীমিত ক্ষেত্রে হলেও গদ্যের ভারবহন ক্ষমতা ও চলনশক্তিকে তাঁরা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এখন পূর্বোল্লিখিত তিনগোষ্ঠীর গদ্য সৃষ্টি-চেষ্টার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

বণিক্‌বেশী শাসকগোষ্ঠীর আবির্ভাবের আগেই বাঙলাদেশে

খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের আবির্ভাব।) এ দেশের দুর্ভাগা পৌত্তলিকদের মধ্যে তাঁরা সত্যধর্মের কথা বলে এবং সেই ধর্মে দীক্ষিত ক'রে যে কল্যাণই করছিলেন, এ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন নিঃসংশয় এবং তাঁদের চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না। জনসমাজে প্রভাব বিস্তারের জন্য পাদরিরা চলতি ভাষার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন এবং সেই জন্যই 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' (১৭৪৩) এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' বই দুটিতে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ এবং হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপাদনের জন্য আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার দেখা যায়। (বাঙলা গদ্যের ক্ষেত্রে এঁদের কৃতিত্বকে তিনটি সূত্রে সংহত করা যেতে পারে: ক। বাইবেলের গদ্যানুবাদ। অবশ্য এই অনুবাদগুলিতে ইংরেজি বাক্‌রীতি ও বাঙালীর পক্ষে অপরিচিত ভাবধারার অনুসরণ করায় বাঙলা গদ্যের আড়ষ্টতা কাটে নি। ['ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে।'—নূতন নিয়ম, যাকোবের পত্র, ১২। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এই উদ্ধৃতি আধুনিক কালের চলতি সংস্করণ থেকে। কেরীর মৃত্যুর (১৮৩৫) কিছুকাল আগে শেষ সংশোধিত সংস্করণে দেখা যায় এই আড়ষ্টভাব সঙ্গে ছিল কমা-সেমিকোলনের অভাব: 'এবং যেমন আমরা আপনাদের ঋণধারিরদিগকে মাফ করি সেই মত আমাদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমারদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।' 'উইলিয়াম কেরী': সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'। পঞ্চম সং। পৃ. ২৩।] (এবং বাক্যের ভারসাম্যও স্থিতিশীল হয় নি। খ। বাঙলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও ব্যাকরণ প্রণয়ন। এই দুটি কাজই অনতিপরোক্ষ ভাবে গদ্য রচনা-রীতিকে নিয়মশৃঙ্খলায় সংযত করেছিল ও গদ্যগ্রন্থরচনায় সহায়তা করেছিল। গ। একদিকে আরবি-ফারসির প্রভাবমুক্ত সংস্কৃত

আদর্শের অনুগমন এবং অন্যদিকে সাহিত্যিক কথ্যভাষার স্থাননির্দেশ। কেরীসাহেবের বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি ক্রমশঃ সংস্কৃত-নির্ভর বাঙলা ভাষার গঠন-সৌষ্ঠবকে মান্য করেছিলেন। কেরী যে 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৮০১) রচনা করেছিলেন তার চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় (১৮১৮) একটি মূল্যবান মন্তব্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

> 'The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other language of India ; …four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East.'

কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, কেরী বাঙলা ভাষার যে সংহতিগুণ ও বলিষ্ঠ অনায়াস গতিকে আনতে চেয়েছিলেন, সংস্কৃতকে নির্ভর ক'রে, সেই পথেই গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়েছিল।

অন্যদিকে 'কথোপকথন' জাতীয় গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদন ক'রে বাঙলা কথ্যভাষার 'elegence and perspicuity'-র (Dialogus… এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই কথ্যভাষাই মৃত্যুঞ্জয় ও সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের প্রভাবিত ক'রে পরবর্তীকালে চলতি ভাষার আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি ক'রে দিয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর গদ্যরচনায় কৃতিত্ব কতখানি তা নির্ণয় করার আগে মনে রাখতে হবে, এই গে কেউই ভাষাকে নতুন ভাবে প্রয়োগ করার জন্য সচেতন ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবেই গ্রন্থরচনার দায়িত্ব তাঁদের নিতে হয়েছিল। মুন্সিয়ানার জন্য কিছুটা খ্যাতি এঁদের নিশ্চয় ছিল এবং সেইজন্যই কেরী তাঁদের গদ্য-অনুশীলনের কাজে লাগিয়েছিলেন।

একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া এঁদের কারুর সামনেই কোনো আদর্শ ছিল না। যাঁরা উর্দু, হিন্দী বা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছিলেন তাঁরা আদর্শ-অভাবে প্রায়ই আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। কেরীর নামে যে দুখানি বই প্রচলিত তাতে অবশ্য সরল আলাপের রীতি, গল্প বলার ছোট ছোট বাক্য রচনারীতি এবং চলতি রীতির বেগ [কথোপকথনের 'কন্দল' অংশ দ্রষ্টব্য] সমস্তই ঠিক পথ ধরেছিল। রামরাম বসুর 'লিপিমালা'য় গতানুগতিক লিখনভঙ্গির অনুসরণ আছে এবং কতক-গুলি মামুলি সংবাদ পরিবেশন ছাড়া আর কিছু নেই, যাতে সাহিত্যিক ভাষার স্পর্শ পাওয়া যেতে পারে। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রম্'-এ আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য ও অন্বয়ের অপটুতা আছে বলে অনেকে রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' বইটির ভাষাকে উন্নততর বলেছেন। কিন্তু রামরামের বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনা আরও জটিল। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাট-বর্ণনায় ও যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রকাশে রামরামের ভাষা যে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, তেমন কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি রাজীবলোচনকে হতে হয়নি। রামরাম একথা ঠিকই বুঝেছিলেন যে আরবি-ফার্সি শব্দকে সম্পূর্ণ বর্জন না ক'রে তাকে ঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে বাঙলা গদ্য আত্মবিকাশের বৈচিত্র্য খুঁজে পাবে। তাই সংস্কৃতের কৃত্রিমতা ছেড়ে তখনকার চিঠি-পত্র, দলিল ও আইন আদালতের ভাষাকে অবলম্বন ক'রে রামরাম দূরদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু দূরদর্শী রামরাম শিল্পী হিসাবে ছিলেন বিশৃঙ্খল। অন্য-দিকে মৃত্যুঞ্জয় দূরদর্শী ছিলেন না, কিন্তু শিল্পী হিসাবে ছিলেন সতর্ক স্থপতি। সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যকে তিনি গভীর অনুভবে আস্বাদন করেছিলেন বলেই বাঙলা গদ্যে মর্যাদা, রুচিবোধ ও ছন্দ-স্পন্দনের ক্ষীণ আভাস তাঁর গদ্যে পাওয়া গিয়েছিল। (তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন'-এ বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র আভাস পাওয়া গিয়েছিল।) 'রাজাবলি'তে তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক ও

সামাজিক ঘটনাকে কালানুক্রমিক ভাবে বর্ণনা করার সৎসাহস দেখিয়েছিলেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় এক বিস্তৃত জ্ঞান ভাণ্ডারকে [অলংকার, ব্যাকরণ, ধ্বনি ও লিপিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি] প্রকাশ করবার মহান পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে মৃত্যুঞ্জয় অপরিণত ভাষার ওপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে তার মধ্যে বয়স্কের সহ্যশক্তি আনবার দুঃসাহসিক চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। তবে কথ্য ভাষার উদাহরণে তিনি শুধু অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের মুখের ভাষাকে লিপিবদ্ধ করলেন, অথচ শিক্ষিত মানুষের কথ্যভাষাকে আমল দিলেন না, এটা কিছুটা সুবিচারের অভাব বলে মনে করি।

(ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যরচনারীতির কৃতিত্বকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা গেল। এঁদের সামগ্রিক কৃতিত্বকে দেখার পর যে ত্রুটিগুলি চোখে পড়ে সেগুলি হলো: ক। শব্দ নির্বাচনে ও প্রয়োগে কৌশলের অভাব, খ। দূরান্বয়-জনিত দুই বাক্যাংশের সম্পর্ক নির্ণয়ে অসুবিধা, গ। সমগ্র বাক্যের দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্যনিরূপণে সুমিতিবোধের অভাব। পরে লক্ষ্য করা যাবে রামমোহন প্রমুখ লেখকদের হাতে এই ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণ দূর হয় নি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে এই সমস্ত ত্রুটি দূর হয়েছিল।)

এখন, (পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে যাঁরা ছিলেন বিদ্যাসাগর-পূর্বযুগের গদ্যলেখক) তাঁদের কৃতিত্বের হিসাব নেওয়া যেতে পারে। এই লেখকগোষ্ঠীর অধিকাংশই সংবাদপত্রকে নির্ভর ক'রে অথবা সংবাদ-পত্রের প্রেরণা পেয়ে স্বাধীনভাবে গদ্যানুশীলনে ব্রতী হয়েছিলেন। তবে সকলে নয়। কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি এঁদের ব্যতিক্রম। যাই হোক, প্রথমে রামমোহনের কথাই ধরা যাক। ধর্মমত সম্পর্কিত বিতর্কের ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কের সময় রামমোহন যে চিন্তার শৃঙ্খলা এবং ভাষার বিন্যাসদক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাতে বক্তব্য স্পষ্ট হয়েই ওঠে। সেদিক থেকে 'দেওয়ানজি জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন' ঈশ্বর-গুপ্তের এই মন্তব্য নির্ভুল। কিন্তু 'রামমোহন রায়ই বাংলা দেশে

গদ্য সাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়াছেন,' রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য ঠিক নয়। কারণ রামমোহন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নামেন নি। বিতর্ক-প্রবন্ধ-নিবন্ধের ক্ষেত্রে রামমোহন প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন; কিন্তু সে সব রচনায় কখনো কখনো কয়েকটি তীক্ষ্ণধার বাক্যছাড়া সাহিত্যরসের সঞ্চার হতে দেখা যায় নি। চিন্তার ক্ষেত্রে 'নব্যবঙ্গের স্রষ্টা' রামমোহন গদ্যভাষার ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম লেখকগোষ্ঠীর তুলনায় খুব বেশি এগোতে পারেন নি। তবে আধুনিক অনুশীলিত মন নিয়ে তিনি গদ্যচর্চায় এগিয়েছিলেন এবং তাঁর গদ্য ললিত মধুর হয় নি বটে, তবে মনীষার দীপ্তিতে এবং ভাবের উচ্চতায় মর্যাদাবান্ হতে পেরেছিল। এখানে রামমোহনের সঙ্গে সমসাময়িক গদ্যলেখকদের রীতির তুলনামূলক আলোচনার জন্য রামমোহন এবং মৃত্যুঞ্জয় উভয়ের গদ্যাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

> ক। দুর্গম বন পর্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। [মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : বেদান্তচন্দ্রিকা' : ১৮১৭]।

এর সঙ্গে রামমোহনের কিছু পরবর্তীকালের গদ্য রচনার তুলনা করা যাক :

> খ। উত্তর, ধর্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চারিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যেহেতু পণ্ডিতলোক সমাগমে চরিতামৃতে তোর পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বহু বিজ্ঞজনের বিদিত না হয়, ও পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যা গমন বর্ণন ওই চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে অতএব ওই লক্ষণদ্বয়ো চরিতামৃত সুতরাং নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন॥ গৌরাঙ্গ যাহার পরমব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয় তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে। ['পথ্যপ্রদান' : ১৮২৩]।

এই দুই গদ্যভঙ্গির তুলনা করলে দেখা যাবে উভয়ক্ষেত্রেই দীর্ঘ বাক্য, শব্দের সঠিক প্রয়োগজ্ঞানের অভাব এবং ভারসাম্যের অভাব প্রত্যক্ষতা ও স্বচ্ছতার প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। কাজেই বলা যেতে পারে সুবিন্যাসের অভাবে রামমোহন ফোর্ট উইলিয়াম লেখক-গোষ্ঠীর থেকে বেশি এগোতে পারেন নি। অন্যদিকে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় কথ্যভাষার ব্যবহার ক'রে কথ্যভাষার যে দিক্ নির্দেশ করেছিলেন, রামমোহনের মধ্যে সেই দিক্ নির্দেশকের কৃতিত্বও দেখি না। কাজেই প্রমথ চৌধুরীর সিদ্ধান্তে আমরাও দ্বিধাহীন :

> 'কিন্তু তাঁহার [রামমোহনের] অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গ-সাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।' [সবুজ পত্র, ফাল্গুন, ১৩২১]

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা সংস্কার করেই বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার সূত্রপাত এবং সেই গদ্যই পরবর্তীকালে সাধু গদ্যভাষার আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' (১৮০৮) থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি :

> 'কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রম ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন। কাহাকে বলেতে কাহাকে প্রীতিতে এইরূপে প্রায় কুমারিকাখণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে যে বর উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে কেহ তাহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা একদিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত করি সে তোমার মনোনীত হয় না। ইহাতে তোমার মনস্থ কি তাহা আমাকে কহ আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করি।'

এই গদ্যে যথাস্থানে কমা বসিয়ে দিলে বিদ্যাসাগরের কমা-সেমিকোলন-বিভক্ত সুবিন্যস্ত তৎসমশব্দপ্রধান উজ্জ্বল গতিশীল সাধুগদ্যের সঙ্গে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

সাময়িক পত্রে গদ্য চর্চার উৎসাহ প্রথম জুগিয়েছিলেন রামমোহন। এই পথে যাঁরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে লেখনী চালনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভবানীচরণ ছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'র লেখক ও খুব সম্ভব সহকারী সম্পাদক এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক। আরও অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদক হলেও ঈশ্বর গুপ্ত মূলতঃ 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসাবেই সুপরিচিত ছিলেন। আর দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র লেখক রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। ভবানীচরণ এবং ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের (১৮৪৭) পূর্বে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখান নি যাতে ফোর্ট উইলিয়ামগোষ্ঠী বা রামমোহনের তুলনায় বাঙলা গদ্য আরও এক ধাপ এগোতে পারে। সেই একই ধরণের দীর্ঘ দূরান্বয়ী বাক্য তাঁদের হাত থেকে বেরিয়েছে, একই রকমের ভারসাম্যহীনতায় তাঁদের গদ্যরীতি রুগ্ণ। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের আগে যে সব গদ্য রচনা করেছেন তা বিদ্যাসাগরের তুলনায় নিরেশ। বরং অক্ষয়কুমার দত্ত কিছুটা ঋজু দৃঢ় শৈথিল্যহীন হ'য়ে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগরের আগেই। অবশ্য এই ভাষাগত ঋজুতা ও দার্ঢ্য হয়তো বিদ্যাসাগরেরই কিছু সংশোধনের ফল। কারণ গদ্যলেখক হিসাবে আবির্ভাবের আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনায় অক্ষয়কুমারের রচনা বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিতেন। অবশ্য সংশোধন করলেও দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর উভয়েই পরে [দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনচরিত এবং অক্ষয়কুমারকে সুপারিশ ক'রে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি দ্রষ্টব্য] অক্ষয়কুমারকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

৩.

এখন, এমন একটি গদ্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করা উচিত যা সাময়িক পত্রের সংসর্গে লেখা নয়, তার থেকে পরোক্ষ প্রেরণা পেয়েও নয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীহট্টবাসী কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি কাশীতে বসে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শেষাংশের সারানুবাদ 'পুরাণবোধোদ্দীপনী, চতুর্থ খণ্ড' রচনা করেন [সম্পাদক : যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, প্রকাশক শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ]। পরে দেখবো বিদ্যাসাগর দীর্ঘ বিন্যস্ত বাক্যের আশ্চর্য ভাবে সমতা বিধান করেছিলেন কমা-সেমিকোলনের নির্ভুল প্রয়োগে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্রের ভাষাতেও লক্ষ্য করা যাবে, সরল বাক্যে এবং কিছুটা জটিল বাক্যেও তাঁর অন্বয় ও পরিমাণজ্ঞান নিঃসংশয়ে শিল্পবোধের পরিচায়ক। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে উদাহরণ দেওয়া গেল :

> 'শ্রীরাধিকা শ্রীদামের শাপগ্রস্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণে বলিতেছেন যে হে কৃষ্ণ, ক্ষণমাত্র তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওনে জন্মের বিচ্ছেদ বোধ হয়। এবম্বিধভাবে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকার প্রাণ ধারণ করিব ? শ্রীকৃষ্ণের উত্তর—হে রাধে, আমার অবস্থানে তোমার ভাবনা কি ? আমি বরাহকল্পে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিব ; ঐ সময়ে তুমি পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবা।'

এই গদ্যে কমা-সেমিকোলনের উপযুক্ত ব্যবহার দেখে মনে হয় বিদ্যাসাগরের পূর্বেই বাঙলা গদ্য মোটামুটি পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়েছিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুঞ্জয় ['প্রবোধচন্দ্রিকা'র কথ্যভাষার নমুনা অংশ দ্রষ্টব্য : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সা. সা. চ.], রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত এবং তত্ত্ববোধিনীর দুই লেখক দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার কমা সেমিকোলন ব্যবহার করেছিলেন : কিন্তু খুব নিয়মিত সচেতনতায় নয়। সে তুলনায় কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্যের বাক্যবিন্যাস-কৌশল ও ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা [যা বিদ্যাসাগরের হাতে নিখুঁত শিল্পকর্ম হয়েছে মনে করি] পূর্বযুগ এবং বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির মধ্যে শিল্পচেতনার ব্যবধান কমিয়ে এনেছে অনেকখানি।

খ ॥ 'বাঙলা গদ্যের জনক' ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর-পূর্ব বাঙলা গদ্যরীতির যে পরিচয় দেওয়া হলো তাতে এমন কথা হয়তো মনে হতে পারে যে, ঐতিহ্যের মধ্যেই

বিদ্যাসাগরের অনেক বৈশিষ্ট্য থেকে যাওয়ায় বা তাঁর গদ্যরীতির পূর্বাভাস অনেকটাই সূচিত হওয়ায় বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে পূর্বালোচকদের নির্দিষ্ট গুরুত্ব আহত হলো। আসলে কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে বিদ্যাসাগরের মতো 'নিয়ত-সচেতন' গদ্যশিল্পী ইতিপূর্বে গদ্যের আসরে আসেন নি। রামমোহনের 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮২৩), গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২৪), ভবানী-চরণের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩)—ইত্যাদি বই-এর কোন কোন অংশে, 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশনে এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত 'সত্য ইতিহাসসার' (১৮৩০) বই-এর কোনো কোনো অংশে বিদ্যাসাগরের পূর্বেকার পরিচ্ছন্ন সাধু গদ্যের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। কমা-সেমিকোলনের ব্যবহার-প্রসঙ্গে একথা একটু আগেও বলেছি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে পরিচ্ছন্ন, ভারসাম্যযুক্ত এবং শব্দের ঐশ্বর্যমণ্ডিত, স্নিগ্ধরুচির গদ্য বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রথম প্রকাশ পেল।

এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে গদ্যশিল্পী রামমোহন সম্পর্কে সমালোচকদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে যুক্তিহীন প্রমাণ করা প্রয়োজন। কারণ, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর এই দুই মনীষীকেই 'বাঙলা গদ্যের জনক' বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন দুই পক্ষের সমালোচক। বিদ্যাসাগর-পূর্ব যুগের আলোচনাতে আমরা মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহনের গদ্যাংশ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছি রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়ে গদ্যের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা বা ভারসাম্য কোনটাই বেশি আনতে পারেন নি। বরং মৃত্যুঞ্জয় সাধুভাষা ছাড়াও কথ্য ভাষার ব্যবহারও দেখিয়েছিলেন ; যদিও তার ব্যবহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিরস্কার, উপহাস বা কটূক্তির মধ্যেই সীমিত থেকেছে।

এখন রামমোহনের কৃতিত্ব ও সীমাকে কিছুটা বিস্তারিত করা যাচ্ছে।

প্রথমতঃ রামমোহনের বাক্যগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ। চার-পাঁচ পংক্তির কমে তাঁর বাক্য শেষ হয় না। অনেক সময় দশ-বারো পংক্তির পর বাক্যে পূর্ণচ্ছেদ আসে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২) থেকে অংশতঃ উদ্ধার করা যেতে পারেঃ

> 'চতুর্থ প্রশ্ন অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবনধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে···॥০॥ উত্তর যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজরচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সম্বিদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবনস্ত্রী ও চণ্ডালিনী বেশ্যা ভোগ করেন সে ২ ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক ?

এই অংশে প্রথম বাক্যটি প্রশ্নের বিবৃতি। পরের দুটি বাক্য উত্তর। উত্তরের প্রথম বাক্যটির প্রথম অংশ ['যৌবন ধন···অতএব শাসনার্হ হয়েন'] খুব বড় নয়। কিন্তু পরের অংশটির [অংশগুলি আসলে স্বাধীন বাক্য] প্রকরণ বাক্য বা clause ['সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান···যবন্যাদি গমন করেন'] রীতিমত দীর্ঘ। এখানেও বাক্য কিন্তু শেষ হয় নি। 'অথবা' দিয়ে বাক্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। 'অথবা' শব্দটির পর যে কর্তা উহ্য, আপাতদৃষ্টিতে তা পূর্বোক্ত 'তাঁহারাও' বলে মনে হয়। কিন্তু পরে 'সে২ ব্যক্তিও' দেখে মনে হয় ওই উহ্য কর্তাটি আসলে 'যে-যে ব্যক্তি।' এটি উহ্যই থেকে গেছে এবং পাঠকের বোধশক্তির ওপর বিশ্বাস

রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ 'তাঁহারাও'-এর সম্পর্কান্বিত হিসাবে 'সেইব্যক্তিও' আসতে পারে না। তাছাড়া বাক্যটির তৃতীয় অংশে ['অথবা···শাসনার্হ হয়েন'] মূল ক্রিয়া 'করেন' যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম বিশেষ্য অংশের পরেই ['পান'-এর পর] না ব'সে অপেক্ষিত থেকে আর একটি বিশেষ্য-অংশে আসার পর দূরান্বিত হয়ে বসেছে। দ্বিতীয়টির সঙ্গে ['ভোগ'-এর সঙ্গে] যোগ অব্যবহিত থাকলেও প্রথমটির সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটি প্রশ্নাত্মক হলেও আসলে নিশ্চয়ার্থক। কিন্তু 'যেহেতু' দিয়ে বাক্য আরম্ভ হওয়ায় এই নিশ্চয়ার্থের জোর চলে গেছে।

এইভাবে বিচার ক'রে দেখা গেল, রামমোহন গদ্যে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার ক'রে, প্রকরণ বাক্যকে দীর্ঘ ক'রে দিয়ে, সমগ্র বাক্যের মধ্যে অসাম্য এনে, কর্তা ও ক্রিয়ার স্পষ্ট অন্বয় না দেখিয়ে, ক্রিয়াকে অপেক্ষিত রেখে, বাক্যের ভাব বা মুডকে প্রশ্ন ও নিশ্চয়ের মাঝামাঝি রেখে দ্বিধায় ফেলে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ গদ্যরীতির বিরুদ্ধে অনেক বাধাই জমিয়ে তুলেছেন। কমা-সেমিকোলন তিনি ব্যবহার করতেন [উদ্ধৃত অংশে অবশ্য কমা-সেমিকোলনের ব্যবহার নেই] এবং অন্বয় জ্ঞানও তাঁর ছিল [স্মরণীয়ঃ 'কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন···' ইত্যাদি ঃ 'বেদান্ত গ্রন্থ'।] কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর ভাষা যে, সুবিন্যস্ত নয় এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্ততঃ কিছুকাল রামমোহনের গদ্যরীতির অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু আর কোনো বড় লেখক রামমোহনের গদ্যরীতি গ্রহণ করেন নি। অন্যদিকে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলির' গদ্যাংশ তুলে দেখিয়েছি মৃত্যুঞ্জয় অনেক পরিমাণে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অন্বয়ের সমস্যা কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং সেই পরিচ্ছন্ন আদর্শের ভিত্তিতেই যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ 'যথোচিত' কমা-সেমিকোলন ও দাঁড়ির ব্যবহার ক'রে বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যের অন্তর্লীন সহজ ছন্দ-স্পন্দনকে

আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সাধারণ বাঙালী এই বিংশ শতকের সাধু গদ্যভাষা ব্যবহারের সময় বিদ্যাসাগরের রচিত ভাষাদর্শকেই মেনে নিয়েছে। সুতরাং ভাষাগত উৎকর্ষের বিচারে আমরা রামমোহনের তুলনায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বকে নিঃসন্দেহে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলবো।

রামমোহনের রচনার যেটি প্রধান গুণ সেটি হলো এই যে, তিনিই বাঙলা গদ্যকে যুক্তি-তর্ক অবতারণার ক্ষেত্রে প্রথম সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। যুক্তির শৃঙ্খলা রচনা করে, যুক্তিকে সুষমভাবে ক্রমে ক্রমে সাজিয়ে, ব্যঙ্গের তীব্র দীপ্তিতে বিরুদ্ধ পক্ষকে অসহায় ক'রে রামমোহন বিতর্ক প্রবন্ধের প্রথম সূচনা করেছিলেন। ধর্মমত সম্পর্কে বিতর্কের ক্ষেত্রে রামমোহন চিন্তা ও ভাষার বিন্যাস-চাতুর্যে যে বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিক গদ্য তিনি রচনা করেন নি। জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধে যুক্তিতর্কের প্রতিষ্ঠাক্ষমতায় তিনি সে যুগের মনীষীশ্রেষ্ঠ। কিন্তু গদ্য-সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে তিনি পূর্বসূরীদের অতিক্রম যে করতে পারেন নি এটা আক্ষেপের বিষয় হলেও কঠিন সত্য। অবশ্য, সংবাদপত্রের মাধ্যমে একদিকে বিদেশী ধর্মযাজকদের, অন্যদিকে দেশীয় পণ্ডিতদের বিরোধিতা ক'রে রামমোহন তর্কযুদ্ধের ভাষায় বাঙালী লেখকদের পোক্ত ক'রে তুলেছিলেন, সাংবাদিক গদ্যের কাঠামোও তৈরি করে দিয়েছিলেন। মিশনারিদের সঙ্গে রামমোহনের যৌথ প্রচেষ্টাতেই বাঙলা সাংবাদিক গদ্যের গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সাহিত্যিক গদ্য বলতে শুধু যুক্তির স্তরে স্তরে বিন্যাস আর প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করবার মতো বিদ্রূপই বোঝায় না। আবার শুধু কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ির প্রয়োগেই গদ্য 'সাহিত্যিক' হয়ে ওঠে না। কমা-সেমিকোলনের ব্যবহার তো বিদ্যাসাগরের আগেও যথেষ্ট দেখা গেছে। তবু বিদ্যাসাগরই যে সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা, রামমোহন নন, তার কারণ বিদ্যাসাগর কমা-সেমিকোলনের 'সিদ্ধ'

ব্যবহারে বাঙলার নিজস্ব পদবিন্যাসরীতিটিকে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন, এবং বাক্যগুলিকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহযোগী ক'রে ভারসাম্য এনেছিলেন। তার ফলে তাঁর রচিত বাক্যের অর্থবোধ হয়ে যেত প্রথম পাঠেই, দ্বিতীয়বার পড়ার প্রয়োজন হতো না। এবং শেষতঃ, প্রয়োজন বুঝে কথ্য ভাষা ও কথ্য স্বরায়ণ রক্ষা করলেও সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডারকে অসাধারণ দক্ষতায় ব্যবহার ক'রে বাঙলা গদ্যের রুচিকর ধ্বনিময়তার দিকটা তিনিই খুলে দিয়েছিলেন প্রথম। আমরা আগেই কেরির 'বাংলা ব্যাকরণ'-এর ভূমিকা থেকে ইংরেজি উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছি, তিনি সংস্কৃতের মতো বাঙলা ভাষার প্রকাশের বলিষ্ঠতা ও সংহতি আনতে চেয়েছিলেন। আবার মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি তিনিও তৎসম প্রধান ভাষাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এবং পরে দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর সেই পথ ধরেই বাঙলা ভাষার ঐশ্বর্যকে বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব ক'রে তুলেছিলেন, ভাষার মধ্যে সাহিত্যগুণ সঞ্চার ক'রে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩ বইটির উপসংহারে এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন তা যুগান্তকারী ঘোষণার মতো মনে হয়ঃ

> 'সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্বন্ধস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না।'

এই ঘোষণাকে শিরোধার্য করেই কাব্যসাহিত্যে মাইকেল এবং গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বসাহিত্যের রাজপথ চিনতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, কমা-সেমিকোলন ও দাঁড়ির 'সিদ্ধ' প্রয়োগে এবং রুচিকর ধ্বনিময়তায় বিদ্যাসাগর রামমোহনকে অতিক্রম করে গেছেন। রামমোহন প্রধানতঃ ব্যাকরণ ও বিতর্কের ক্ষেত্রেই ভাষাকে

প্রয়োগক্ষম ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর গল্পে, ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনায়, পাঠ্যপুস্তক রচনায় ['বোধোদয়' বইতে বিচিত্র বস্তু-জগতের বর্ণনার সম্মুখীন হতে হয়েছে], ব্যাকরণ রচনায়, বিদ্যার বিভিন্ন শাখার প্রখ্যাত মনীষীদের জীবনী রচনায় [যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্রের বিচিত্র পারিভাষিক শব্দের সম্মুখীন হতে হয়েছে: 'জীবনচরিত' ও 'চরিতাবলী' বই দুটি দ্রষ্টব্য], সরস ব্যঙ্গ রচনায় এবং একেবারেই ব্যক্তিগত রচনায় গদ্যের বিচিত্ররূপ দেখিয়ে গেছেন। এই বহুচারিতা ছাড়াও দেখি তিনি রামমোহনের মতো বিতর্ক-মূলক প্রস্তাবগুলি লিখে রামমোহনের বিতর্কনিবন্ধের ধারাটি অব্যাহত রেখে গেছেন। বিদ্যাসাগরের বহুবিষয়মুখী গদ্য রচনার তুলনায় রামমোহনের গদ্যের ব্যবহার নিতান্তই সীমিত। কাজেই বিদ্যাসাগরের কাহিনী-কথনের ভাষার সঙ্গে রামমোহনের ভাষার তুলনা চলে না, কারণ তুলনার ভিত্তি থাকে না। একই ধরণের বিষয়ের ভাষার তুলনা করাই উচিত এবং তা করতে গেলে উভয়ের বিতর্ক নিবন্ধের ভাষাই বিচার্য।

রামমোহনের গদ্য ('সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'):

১। 'দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোনও উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপন ২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি ২ দুর্গতি না পায়?'

বিদ্যাসাগরের গদ্য ['বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব']:

২। 'বিবাহের পর, পতিকে সন্তুষ্ট রাখা, স্ত্রীর পক্ষে, যেমন আবশ্যক বলিয়া নির্দেশ আছে, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাও, পুরুষের পক্ষে, সেইরূপ আবশ্যক বলিয়া নির্দেশ আছে। স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, তাহার পক্ষে যে বিষম পাতক স্মরণ আছে, পুরুষ অন্য নারীতে উপগত হইলে, তাহার পক্ষেও সেই বিষম পাতক স্মরণ আছে। স্ত্রী মরিলে, অথবা বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষের পক্ষে যেমন পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে, পুরুষ মরিলে অথবা ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে। কুৎদার ব্যক্তিকে বিবাহ করা, স্ত্রীর পক্ষে যেমন অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও, পুরুষের পক্ষে সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে। ফলতঃ শাস্ত্রকারেরা, এ সকল বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে, সমান ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরুষজাতির অনবধানদোষে, স্ত্রীজাতি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে।'

এই দুটি উদ্ধৃতির তুলনা করলে দেখা যাবে, রামমোহন কমা, সেমিকোলন ব্যবহার করেও বাক্যের মধ্যে দীর্ঘ প্রকরণবাক্য এনে ফেলেছেন, বাক্য শেষ করতে গিয়েও শেষ করতে পারেন নি, 'অথবা'-র পরেও 'তথাপি' এসেছে, দ্বিতীয়বার 'অথবা' এসেছে এবং তারপর কর্ম ও ক্রিয়ার দেখা মিলেছে। এরপর যে সেমিকোলন এসেছে তা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণচ্ছেদের কাজই করেছে। এই সব কারণে বাক্যগুলি ঋজু ও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি, যদিও মোটামুটি অর্থবোধে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি বাক্য আভ্যন্তরীণ বিভাগে সুষম। ছটি বাক্যই অনতিদীর্ঘ, অযথা প্রকরণবাক্যে দীর্ঘায়িত হয়ে পূর্ণচ্ছেদের প্রত্যাশাকে আঘাত করেনি, এবং বাক্যের মধ্যেকার যতি চিহ্নগুলি নিঃশ্বাসের ওঠানামার সূক্ষ্ম স্পন্দনকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। এই গুণটিকেই রবীন্দ্রনাথ বোধহয় 'অংশ যোজনার সুনিয়ম' বলে বিদ্যাসাগরচরিতে উল্লেখ করেছিলেন। এবং তুলনায় রামমোহনের গদ্যকে বোধহয় তাঁরই ভাষায় বলা চলে 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা'। বাক্যের মধ্যে 'সৈন্যদলের শৃঙ্খলা' বিদ্যাসাগরই এনেছিলেন, রামমোহন নন। এছাড়া বিদ্যাসাগর

গদ্যভাষায় আরো কিছু গুণ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। তার প্রথমটি হলো 'রুচিকর ধ্বনিময়তা' যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' থেকে এই গুণ-সঞ্চারের প্রমাণ দেওয়া গেল ঃ

> 'একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা ; তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতেছিল ; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন ; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্তি ভূতপ্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে ; কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চর্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে ; আর চারিদিকে অনবরত কেবল মার্‌মার্‌, কাট্‌ কাট্‌ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ করিতেছে।'

ভয়ানক রসের উদ্বোধনে ব্যঞ্জনবর্ণের এই গম্ভীর নির্ঘোষ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে 'দুর্গেশনন্দিনী'-'কপালকুণ্ডলা'র লেখককে প্রেরণা দিয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যতিচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগে, সুষম বিভাগে বাক্যগুলির অন্তর্নিহিত পদক্ষেপকে দৃঢ় ক'রে এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি' নির্বাচন ক'রে বিদ্যাসাগর ভাষার 'গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় গুণটি হলো হৃদয়াবেগের নিবিড় সংহত প্রকাশ। এই আবেগের ফলেই তাঁর গদ্য প্রাণময় হয়েছে। এবং এই প্রাণময়তা রামমোহনের বিতর্ক প্রবন্ধে দেখা যায়নি। বিদ্যাসাগরের অনুবাদ বা স্কুলপাঠ্য বইগুলিতে ব্যক্তিক অনুভূতি প্রকাশের কোনো সুযোগই ছিল না। কিন্তু তাঁর আন্তরিক অসীম করুণা যখন বিরোধীশক্তির প্রতিকূলতায় বা শোকের আঘাতে বিমথিত হয়েছে তখন তাঁর শান্তস্নিগ্ধ গম্ভীর রচনাভঙ্গিটি আবেগের

প্লাবনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে ; উচ্ছ্বসিত ভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েনি। এর কারণ তাঁর সেই 'অখণ্ড পৌরুষ' যা সমস্ত আবেগ ও আঘাতকে সংহত করে 'মার্জিত' বাক্যেই প্রকাশ হতো। এবং এই সংযমগুণেই ব্যক্তিগত অনুভব সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে তাঁর 'বিধবা বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে', 'আত্মজীবনী'তে এবং 'প্রভাবতী-সম্ভাষণে'। এই রচনাভঙ্গির সমর্থনে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

১। 'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে, সংসার-তরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম ; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।' ['বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক']

২। 'বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না, একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।' ['প্রভাবতী সম্ভাষণ'।]

এই সংহত গদ্যকাব্যশিল্পের স্রষ্টা বিদ্যাসাগর যে রামমোহন থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসে বঙ্কিমী ভাষার দিগন্তে উদিত হয়েছেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

তবু 'বাঙলা গদ্যের জনক' এই বিশেষণে বিদ্যাসাগরকে বিশেষিত করাটা ঠিক হবে না ; বোধহয় প্রসঙ্গক্রমে যাদের কথা আলোচিত হলো তাঁদের কারুর সম্পর্কেই এই একক সম্মান প্রদর্শন উচিত নয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে প্রথম ভাষাশিল্পচেতনা দেখা দিয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি সেই চেতনার ধারা রক্ষা ক'রে শৃঙ্খলা আনতে পেরেছিলেন। রামমোহন ভাষা-শিল্পসচেতন না হলেও বিতর্কমূলক আলোচনায় গদ্যের প্রথম পরীক্ষা করলেন এবং সাংবাদিক গদ্যেরও নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অন্ততঃ বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত রামমোহনকেই অনুসরণ করছিলেন। অক্ষয়কুমারের গদ্যে ঋজুতা ও কিছুটা প্রবাহ-বেগ বা ইলোকয়েন্স [ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণে বক্তৃতা, ১৮৪৫ দ্রষ্টব্য] এসেছিল এবং এই সবকিছুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই বিদ্যাসাগর মার্জিত, সুষম ও ধ্বনিময় ভাষার একটা আদর্শ সৃষ্টি করলেন। কাজেই পূর্বপ্রচেষ্টার সফলতা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাতেই বিদ্যাসাগর যদি এই গদ্যের common style তৈরি করে থাকেন তাহলে তাঁকে 'জনক' এই সম্মান দিই কী করে? আসলে ভাষার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করলে তার বহু-জনকত্বকেই স্বীকার করতে হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরীরা প্রত্যেকেই বাঙলা গদ্যের সম্ভাব্য শিল্পরূপের অবয়বটিকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করছিলেন এবং সেই উন্মোচনের পর্ব শেষ হয়েছিল বিদ্যাসাগরেরই হাতে। বলা বাহুল্য, এই 'শিল্পরূপ' অর্থে গদ্যরীতির ভিত্তিভূমিকেই বোঝাতে চাইছি। পরে এই ভিত্তিভূমিকে আশ্রয় করেই বঙ্কিমচন্দ্র আরো দ্রুতপদক্ষেপের বহুঝঙ্কৃত ব্যক্তিক-প্রবণতা-নিয়ন্ত্রিত individual style-এর সৃষ্টি করলেন। যাই হোক বিদ্যাসাগর ভাষাকে যৌবন দিয়েছিলেন এবং সেইদিক থেকে তাঁকে বাঙলা গদ্যের 'যৌবনশক্তির জনক' বলে চিহ্নিত করতে আপত্তি নেই।

গ ॥ অনুবাদক বিদ্যাসাগর : 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'

অনুবাদক হিসাবেই বাঙলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। 'বৈতালপচ্চীসী'র বাঙলা অনুবাদ (১৮৪৭) করেই বিদ্যাসাগর গল্পরসিক বাঙালীর মন কেড়ে নিয়েছিলেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'

তাঁর প্রথম মুদ্রিত বই হলেও তার আগে 'বাসুদেবচরিত' নামে এক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গদ্যগ্রন্থের অনুবাদ যে তিনি করেন তা বিদ্যাসাগরের দুই জীবনীকারই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ায় এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা পাইনি। কেউ কেউ বলেছেন 'বাসুদেব চরিত'-এর অনুবাদক বিদ্যাসাগর নন, এ ব্যাপারটা দুই জীবনীকারের মিথ্যা প্রচার। কিন্তু এই মন্তব্যের সপক্ষেও কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণ নেই। যাই হোক, তাঁর দ্বিতীয় বইটিও অনুবাদ, জন ক্লার্ক মার্শম্যান সাহেবের *Outlines of the History of Bengal for the use of Youths in India* বইটির শেষ ন'টি অধ্যায় এবং অন্যান্য কয়েকটি বইয়ের উপকরণের সারানুবাদ: 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮)। তৃতীয় বইটিও চেম্বার্সের *Exemplary Biography*-র অনুবাদ 'জীবনচরিত'। চতুর্থ বইটি চেম্বার্সেরই লেখা *Rudiments of Knowledge*-এর থেকে কিছু কিছু তথ্য নিয়ে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য ইংরেজি বই-এর তথ্য মিশিয়ে সারসংকলন জাতীয় বই: 'বোধোদয়' (১৮৫১)। কাজেই এটিকেও বিভিন্ন ইংরেজি বই থেকে সংগৃহীত তথ্যের সারানুবাদ বলতে পারি। এরপর অন্য দুএকটি ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের সারানুবাদ 'শকুন্তলা'। এর পর অন্যান্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই এক-একটি অনুবাদ করতে দেখা গেছে তাঁকে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড টামস্ জেম্স্'-এর ঈসপের রচিত গল্পের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে 'কথামালা'। পরের উল্লেখযোগ্য রচনা মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অনুবাদ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হলেও ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে এই অনুবাদ শেষ হয়ে যায়। এই সালেই ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এর প্রথম অঙ্ক এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অনুসরণে লেখেন 'সীতার বনবাস'। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রকাশিত হয়। বিশেষ কোনো বই-এর অনুবাদ না হলেও বিভিন্ন ইংরেজি বই থেকে গল্পগুলি অনূদিত হয়েছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের *Comedy of Errors* অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রকাশিত হয়। এইটিই তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য অনুবাদের বই। এর পরে বহু বিবাহ রহিত বিষয়ক দুটি পুস্তক এবং স্বরচিত জীবনী ছাড়া আর যা লিখেছেন তাতে তাঁর সাহিত্যকৃতির পরিচয় তেমন নেই।

এখন আমাদের আলোচ্য দুটি অনুবাদ গ্রন্থের ক্ষেত্রে আসা যাক। প্রথমেই 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) বইটির অনুবাদ-কর্মের দক্ষতার স্বরূপ বিচার করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাসাগর কালিদাস সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং কালিদাসের চারটি বই এর সুসম্পাদিত সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন: ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'রঘুবংশম্', ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'কুমারসম্ভবম্', ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 'মেঘদূতম্' এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'।" 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) বইতে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন: 'সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।...উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অলৌকিক পদার্থ।'

শকুন্তলা ও অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যের বাঙলা অনুবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছিলেন। প্রথমতঃ মূল সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব পরিচয় সাধন। দ্বিতীয়তঃ বাঙলা গদ্যের সংস্কার সাধন। অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়েই তিনি ভাষার আদর্শ স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত প্রস্তাবটির উপসংহারে (আগে উদ্ধৃত করেছি) তিনি বলেছিলেন যে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ নিয়েই সমৃদ্ধ হতে হবে। বেশ কিছুটা দ্বিধা নিয়েই শকুন্তলার বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন:

'এই উপাখ্যানে মূল গ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট, কালিদাসের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের এইরূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, কত শতবার, আমায় তিরস্কার করিবেন।'

মূল সংস্কৃত নাটকের কাহিনী বাঙলা গদ্যে রূপান্তরিত করলে মূলের অনেকখানি সৌন্দর্য যে নষ্ট হয় সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর সচেতন ছিলেন। কিন্তু সে ত্রুটি মেনে নিলেও বলা যেতে পারে মূলের উপাখ্যান-রসকে তিনি বাঙলা গদ্যে আশ্চর্যভাবে সঞ্চার করতে পেরেছিলেন এবং শকুন্তলার এই উপাখ্যান পড়ে মূলের সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি। তার প্রধান কারণ, মূল নাটকের নাট্যোচিত সংলাপ, ভনিতা এবং 'অপ্রয়োজনীয়' অলৌকিকতা বাদ দিয়ে, আদিরসাত্মক দৃশ্যকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত ক'রে, অনেক ক্ষেত্রে কবিত্ব ও অসাধারণ বর্ণনা-কৌশলকে বাদ দিয়ে বিশেষ ভাবেই কাহিনীরসকে এযুগের পাঠকের মতো ক'রে পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছেন।

কাহিনীর দিকেই যে তাঁর ঝোঁক ছিল তা 'শকুন্তলা'র আরম্ভেই বুঝতে পারা যায়। নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার ও নটীর যে সংলাপ আছে তা বিদ্যাসাগর একেবারেই বাদ দিয়ে মূল গল্পের মধ্যে চলে এসেছেন এবং নাটকীয়ভাবে মৃগানুসন্ধানী বাণক্ষেপোদ্যত রাজার বর্ণনা দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত করেছেন। তারপর হরিণের প্রাণভয়ে পলায়নের যে দৃশ্য কালিদাস একটু দীর্ঘ ক'রে আশ্চর্য উপমায় বর্ণনা করেছেন ['গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ। পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্'···ইত্যাদি] এবং হরিণকে অনুসরণকারী ধাবমান অশ্বের যে চমকপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন ['মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া নিষ্কম্প-চামর-শিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ' ···ইত্যাদি] তা বিদ্যাসাগর বাদ দিয়েছেন এবং হরিণশিশুর

ক্ষেত্রে 'প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে' এবং অশ্বের ক্ষেত্রে 'বায়ুবেগে' শুধু এই দুটি বিশেষণে মূল বর্ণনাকে সংহত করে নিয়েছেন। কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে অপরিহার্য অংশগুলিকে প্রয়োজন মতো বেছে নিয়ে বিশ্বস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই এই বিশ্বস্ততার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মূল নাটক : প্রথম অঙ্ক :

> রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।
> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে
> তূলারাশাবিবাগ্নিঃ।
> ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং ক্ব চ নিশিতনিপাতা
> বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
> তৎ সাধু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
> আর্তত্রাণায় তে শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি॥

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

> মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরাপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।

'তূলারাশিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো' এই উপমাটি বোধহয় সংলাপে কৃত্রিম শোনাবে ভেবে তিনি বাদ দিয়েছেন। তা ছাড়া বাকি অংশ বিশ্বস্তভাবে ভারসাম্যযুক্ত গদ্যে বলিষ্ঠ ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রথম অঙ্কেই যেখানে রাজা আড়াল থেকে শকুন্তলা আর সখীদ্বয়ের আলাপ শুনছেন সেখানে শকুন্তলা এক জায়গায় বলেছে তার বক্ষবন্ধন শিথিল করে দিতে :) 'সহি অণসূএ! অদি পিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদহ্মি, সিতিলেহি দাবণং।'(অনসূয়া শকুন্তলার বক্ষবন্ধন শিথিল ক'রে তার পয়োধরবিস্তারী আত্মযৌবনকে ধিক্কার দিতে বলেছে :) 'এত্থ পওহর-বিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবলিহ।' বিদ্যাসাগর এই অংশ একেবারে বাদ দিয়ে, রাজার মুখে যে বিস্ময়-

প্রকাশক-উক্তি আছে তার অনুবাদে মনযোগ দিয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে মূল নাটকে কুশহস্তে কণ্বশিষ্যের প্রবেশ ও শকুন্তলার প্রতি সহানুভূতিসূচক দীর্ঘ উক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজা পূর্বরাগার্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে যে দীর্ঘ স্বগতোক্তি করেছেন তার মধ্য থেকেও আদিরসাত্মক উক্তিগুলির অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে। চরণচিহ্নের প্রতি দৃষ্টি রেখে শকুন্তলার শারীরিক সৌন্দর্যের যে ইশারা রাজা পেয়েছেন ('অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ। দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা॥') তা সমস্তই বাদ দিয়ে শুধু বলা হয়েছে: 'রাজা, ক্রমে ক্রমে, সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শকুন্তলা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।' কিংবা ওই অঙ্কেই শেষের দিকে যখন রাজা তৃষিত ভ্রমরের মতো শকুন্তলার অক্ষত অধরটিকে তুলে চুম্বন করতে গেছেন (অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন। অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥) সেই অংশেরও আদিরসাত্মক দৃশ্য বাদ দিয়ে বিদ্যাসাগর শুধু লিখেছেন: 'অনন্তর রাজা. শকুন্তলার চিবুকে হস্তপ্রদান করিয়া তাঁহার মুখকমল উত্তোলিত করিলেন'। (চতুর্থ অঙ্কটিকে অনেকেই নাটকের শ্রেষ্ঠ অঙ্ক বলে মনে করেন।) মোটামুটি প্রথম থেকেই এই অঙ্কটিকে বিশ্বস্তভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। কেবল মূল নাটকে যেখানে শিষ্যের মুখে গুরুদেব কাশ্যপ বা কণ্বের প্রবাস-প্রত্যাগমন শোনা গেছে এবং তার মুখেই প্রভাতকালের আশ্রমের বর্ণনায় যেখানে অন্তর্হিত চন্দ্র ও বিরহিণী কুমুদিনীর প্রসঙ্গে ব্যঞ্জনায় শকুন্তলার বিরহার্তি আভাসিত হয়েছে সেই অংশ বিদ্যাসাগর বাদ দিয়েছেন। মনে হয় ঘটনার আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হবে বলেই এই প্রাকৃতিক বর্ণনা [শকুন্তলার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও] বাদ দেওয়া হয়েছে।

মাঝে মাঝে চরিত্রের সংলাপে বিদ্যাসাগর (একটি দুটি বাক্য জুড়েও দিয়েছেন যাতে অনুভবে গভীরতা আসে এবং সেই ধরণের বাক্যকে সমগ্র উক্তির তাৎপর্যের সঙ্গে অন্বিত করেই প্রয়োগ করেছেন।) যেমন:

চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রার চিন্তায় কাশ্যপ (কণ্ব) বলেছেন :

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠ-স্তম্ভিত-বাষ্প-বৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়া-বিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥

বিদ্যাসাগর এই অংশের অনুবাদ করতে গিয়ে লিখছেন :

'অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য ! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমার ঈদৃশ-বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা, এমন অবস্থায়, কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।'

এই শেষ বাক্যটি মূলে নেই। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সূত্রাকারে সংহত এই সিদ্ধান্ত যদিও পূর্ববাক্যেরই অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা তবু এর উচ্চারণে বনবাসী ঋষির স্নেহদীর্ণ করুণ ব্যক্তিত্বটি স্পষ্টতর হয়েছে। ঠিক এই স্বগতোক্তির পরে মূল নাটকে কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহযাত্রার আগে আশীর্বাদ করেছেন এবং যজ্ঞাগ্নির তাপ নিয়ে পবিত্র হতে বলেছেন। অনুবাদে এই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পরেকার তপোবন তরুদের কাছে কণ্বের অনুমোদন গ্রহণের অংশটুকু অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু আবার আশ্রম তরুদের অলঙ্কার-আভরণদা'নের দৃশ্যটিকে অলৌকিকবোধে বাদ দিয়েছেন। শুধু বলা হয়েছে : 'অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, যথাসম্ভব, বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন।' মনে হয় চতুর্থ অঙ্কের মূল বক্তব্য যে শকুন্তলার আশ্রমবিচ্ছিন্ন হওয়ায় যন্ত্রণা তার প্রতি বিদ্যাসাগর নজর রেখেছেন এবং আশ্রম-প্রকৃতি ও প্রাণীদের সঙ্গে শকুন্তলার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে গিয়ে শকুন্তলার যন্ত্রণা ও ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা—এই অংশগুলির প্র ত বিদ্যাসাগর নজর রেখেছেন বেশি। অন্য সংলাপ অপ্রয়োজনবোধে

বর্জন করেছেন। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এসে দৈববাণীতে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের সাক্ষাতের কথা জানতে পেরেছিলেন। প্রিয়ংবদার মুখে আমরা সেকথা শুনেছি: 'অগ্গিসরণং পবিট্ঠস্স সরীরং বিণা ছন্দোময়ীএ বাণিআএ।' বিদ্যাসাগর এই দৈববাণীকে কিন্তু অনুবাদে রক্ষা করেছেন। মনে হয় পিতা কণ্বের কাছে এ সংবাদ কারুরপক্ষে দেওয়া অসম্ভব ভেবেই অপরিহার্য বিবেচনায় দৈববাণীকে বাদ দিতে পারেনি তিনি। কিন্তু পতিগৃহে যাবার সময় আকাশবাণীর কল্যাণ-দান বাদ দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি তাঁর।

পঞ্চম অঙ্ক থেকেও এমন একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বলা যায় যা বিদ্যাসাগর বাদ দিতে পারেন নি।) এই অঙ্কের শেষে পুরোহিতের মুখে রাজা শুনলেন: 'দেব! পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বাপা বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।...স্ত্রী-সংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাদ্ উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম।' বিদ্যাসাগর এই অংশের অলৌকিতাকে বজায় রেখেই লিখছেন: 'মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, অপ্সরাতীর্থের নিকট, আপন অদৃষ্টের দোষকীর্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি এক জ্যোতিঃপদার্থ, স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল।' (এখানে এই অলৌকিকতা প্রয়োজনীয় এইজন্য যে এই ঘটনা রাজাকে বাইরে বিচলিত না করলেও রাজার অন্তরে ব্যাকুলতা নিয়ে এল। মূল নাটকে রাজার সেই দীর্ঘ ব্যাকুলিত স্বগতোক্তি অবশ্য বিদ্যাসাগর সংক্ষিপ্ত ক'রে নিয়ে একটি বাক্যে সংহত করে বলেছেন: 'রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয় হইয়াছিলেন; এজন্য, অবিলম্বে সভাভঙ্গ করিয়া, শয়নাগারে গমন করিলেন।' যে স্বগতোক্তি নাটকে মানায়, গল্পকাহিনীতে তাকে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে ব'লে দিয়ে বিদ্যাসাগর কাহিনীর উৎকর্ষ বাড়িয়েছেন বলেই মনে হয়।)

(মূলনাটকে নারী, বিদূষক, রাজশ্যালক, রক্ষিদ্বয় এবং ধীবরের

প্রাকৃত বাক্যগুলির অনুবাদে বিদ্যাসাগর মৌখিক ভাষাকে অবলম্বন করেছেন :

> 'গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন ; এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত-প্রদান করিয়া, কহিলেন, বাছা ! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল ; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে ? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি ! আজ বড় অসুখ হয়েছিল ; এখন অনেক ভালো আছি।'

মূলের থেকে একটি-দুটি বাক্য বেশি প্রয়োগ করে মৌখিক ভঙ্গি এনে আশ্রমের পারিবারিক আত্মীয়তাকে নিবিড় করে তুলেছেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে নগরপাল, ধীবর ও দুইরক্ষীর সংলাপের ভাষা রূপে সাধু হলেও ভঙ্গিতে চলতি।

> 'নগরপাল শুনিয়া, কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর বেটা, আমি তোর জাতিকুল জিজ্ঞাসিতেছি নাকি এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্। ধীবর কহিল, আজ সকালে, আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া, উহার পেটের ভিতরে, এই আংটি দেখিতে পাইলাম। তারপর, এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময় আপনি আমায় ধরিলেন, আমি আর কিছুই জানি না ; আমায় মারিতে হয় মারুন, কাটতে হয় কাটুন ; আমি চুরি করি নাই।'

শেষ বাক্যাংশটির মূল হচ্ছে 'মালেহ বা মুঞ্চেহ বা অঅং শে আঅমবুত্তন্তে ॥' অর্থাৎ এর সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল 'মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন। এইভাবেই আংটিটি হাতে এসেছে।' কিন্তু বিদ্যাসাগর এর অনুবাদে বাঙলা বাগ্‌বিধি মেনে চলেছেন এবং তাতে কথ্যভাষার সরসতাই প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের এই সাধুরূপে লেখা চলতি ভঙ্গির ভাষা 'আলালের ঘরের দুলালে'র চার পাঁচ বছর আগেকার রচনা অথচ ভাষারীতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে চলতি রীতির এই রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি কেউই দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি আলোচনায় বিচ্ছিন্নভাবে এই চলতি রীতির প্রতি কেউ কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মাত্র।

সপ্তম অঙ্কের শেষে মারীচের আশীর্বাদ এবং রাজা ও মারীচের কথোপকথনের সারসংক্ষেপ ক'রে বিদ্যাসাগর 'ভরত বাক্যে'র প্রথম অংশটুকু গ্রহণ করে শেষ করেছেন : 'তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সস্ত্রীক, সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক, পরম সুখে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে [ভরতবাক্যের প্রথম অংশে আছে : 'প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ' ··ইত্যাদি] লাগিলেন।'

সুতরাং মূল নাটকের কিছু কিছু অংশ তুলে দেখা গেল বিদ্যাসাগর মূল নাটকের সংলাপের অনেক অংশ বজায় রেখেছেন, তবে দীর্ঘ কথোপকথন, আদিরস, স্বগতোক্তি, অপ্রয়োজনীয় অলৌকিকতা, কবিত্বময় উপমা-অলংকার বাদ দিয়েছেন। অনেক সময় এই বাদ দেওয়ার জন্যই তাঁকে দু-একটি বাক্য জুড়ে সংযোজকের ভূমিকা নিতে হয়েছে। অনেক সময় তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে পাঠকের কাছে মর্মভেদী করতে গিয়ে এক একটি বাক্যও জুড়েছেন তিনি। আধুনিক যুগ ও ছাত্রসমাজ সম্পর্কে সচেতন থেকেই বিদ্যাসাগর এই পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছিলেন। তাছাড়া মনে রাখতে হবে তিনি নাটকের অনুবাদ করেননি, নাটকের 'উপাখ্যানভাগ সংকলন' [বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য] করেছিলেন। তবে উপাখ্যানের নাটকীয় বেগ রক্ষা করবার জন্য তিনি মূল নাটকের কাহিনা-গ্রন্থন-পরিকল্পনা রক্ষা করেছেন। অনুবাদে বা অনুসরণে তিনি সর্বত্রই রুচিকর ধ্বনিময়তা বজায় রেখে সংস্কৃতের 'সৌম্য ও সরল' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। ধীবর, রক্ষী, নগরপাল ইত্যাদির ভাষায় চলতি রীতিই রুচিকর হবে ভেবে নির্দ্বিধায় সেগুলির প্রয়োগ ক'রে ব্যক্তি ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাষার ধ্বনিসঙ্গীত বদলে দিয়েছেন এবং পারিপার্শ্বিকের বিবেচনায় ধীবর, রক্ষী বা নগরপালের ভাষায় বাঙলা বাগ্‌বিধি রুচিকরই হয়েছে।

'সীতার বনবাস' (১৮৬০) বইটির বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছিলেন :

> 'এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তর চরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্কলিত হইয়াছে।'

সীতার বনবাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কাহিনী গৃহীত হয়েছে ভবভূতির উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্ক থেকে। শকুন্তলার মতো এক্ষেত্রে অঙ্ক অনুযায়ী পরিচ্ছেদ ভাগ করেন নি। কারণ উত্তর-চরিতের 'চিত্রদর্শন' নামক প্রথম অঙ্কে চিত্রদর্শন থেকে লোকাপবাদ এবং রামের সীতা পরিত্যাগের সংকল্প পর্যন্ত কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ। সেইজন্য বিদ্যাসাগর চিত্রদর্শন এবং লোকাপবাদজনিত রামের সীতা পরিত্যাগের সংকল্প—এই দুটি পৃথক্ পরিচ্ছেদে ঘটনাকে সাজিয়ে দিয়েছেন; কাহিনীকে দীর্ঘ ও মন্থর হতে দেননি। তাছাড়া শকুন্তলার মতোই এখানে মূল নাটকের নান্দী ও সূত্রধারের কথোপকথন বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এই কথোপকথন থেকেই প্রয়োজনীয় বর্ণনাগুলি নিয়ে সীতার বনবাসের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি অনুচ্ছেদ কেবল মূল কাহিনীকে উপস্থাপনের ভূমিকাস্বরূপ রচনা করা হয়েছে।

এরপর থেকে মোটামুটি বিশ্বস্তভাবে মূলকাহিনীর অনুসরণ চলেছে। তবে চিত্রদর্শনের বর্ণনা কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যেমন, পম্পা ও মাল্যবান পর্বতের মাঝখানে লক্ষ্মণ একবার হনুমানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সীতা বলেছেন, 'চিরদুঃখিত জীব-লোকের উদ্ধারকারী অতএব প্রভূত উপকারী ও মহানুভাবশালী এই সেই হনূমান্।' রাম উত্তরে বললেন, 'ভাগ্যবশতঃ মহাবাহু ও অঞ্জনার আনন্দবর্ধক এই সেই হনূমানকে দেখছি। তার বলে আমরাও কৃতার্থ হয়েছি, ত্রিভুবনও কৃতার্থ হয়েছে।' কিন্তু 'সীতার বনবাস'-এ এই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। চিত্রপ্রদর্শিত চরিত্রের কথা আগেই শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশই স্মৃতি-আলোড়নের উত্তেজক হিসাবে বর্ণিত হচ্ছে। মাঝখানে হনূমানের

বীরত্বকীর্তি কিছু বিসদৃশ ঠেকবে এই ভেবেই বোধহয় হনুমানের বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে। দুর্মুখের কাছে লোকাপবাদের মর্মঘাতী সংবাদ শুনে রাম যে বিলাপ করেছেন সেখানেও মূল নাটকের দীর্ঘ সমাসবাহিনীকে ভেঙে দিয়ে রামের বিলাপকে অনেক বেশি স্বাভাবিক ও আন্তরিক ক'রে তুলেছেন বিদ্যাসাগর। মূল নাটকে আছে :

> 'হা দেবি! দেবয় জনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রীকৃতবসুন্ধরে! হা জনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতী প্রশস্তশীলশালিনি! হা রামৈকজীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা তাতপ্রিয়ে! হা স্তোকপ্রিয়বাদিনি! কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ।'

বিদ্যাসাগর এর অনুসরণে লিখছেন :

> হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাস সহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর।

মূল নাটকে উপরে উদ্ধৃত অংশের পরেও রামচন্দ্র সীতা সম্পর্কে দুর্মুখের সামনে আরও বিলাপ করেছেন ['ত্বয়া জগন্তি পুণ্যানি ত্বয্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ···' ইত্যাদি, 'শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং···' ইত্যাদি, 'অপূর্বকর্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে! বিমুঞ্চ মাম্···' ইত্যাদি], প্রজাদের সম্বন্ধে কটূক্তি করেছেন। বিদ্যাসাগর সে সব অংশ বাদ দিয়ে রামচন্দ্রের বেদনাকে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত ক'রে সংহত-গভীর করতে পেরেছেন।

এইভাবে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়ে বিদ্যাসাগর সীতার বনবাসের গল্পটিকে আশ্চর্য রমণীয় ভাষায় বর্ণনা করে প্রায় নিজস্ব সৃষ্টির পর্যায়ে তুলে এনেছিলেন। অনুবাদক বিদ্যাসাগরের ভিতরকার স্বাধীনস্রষ্টা যে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে তার প্রমাণে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। প্রস্রবণ পর্বতের পরিচিত বর্ণনাটির কথাই ধরা যাক। মূল নাটকে আছে :

> অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তর স্নিগ্ধপরিসরারণ্যপরিণদ্ধগোদাবরীমুখর-কন্দরঃ সন্ততমভিষ্যন্দমানমেঘমেদুরিত নীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।

'সীতার বনবাস'-এ বিদ্যাসাগর লিখছেন :

> এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সততসঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

মূলের ঘনপিনদ্ধ বর্ণনাকে বিদ্যাসাগর অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভিন্নবাক্যে। না দিয়ে উপায় নেই। সংস্কৃত ভাষার ঘনত্ব বাঙলায় রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব অন্যত্র। এই মূলের দৃশ্যসৌন্দর্য বজায় রেখেও শব্দ নির্বাচনে স্বাধীনতা নিয়ে তিনি এমন শব্দ বসিয়েছেন যেগুলির ধ্বনিবিন্যাস আশ্চর্যভাবে সঙ্গীতধর্মী হয়ে উঠেছে। 'অবিরলানোকহনিবহ'-এর অনুপ্রাসের তুলনায় 'ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধবনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন'-এই অনুপ্রাস অনেক বেশী সঙ্গীতধর্মী। 'সন্ততমভিষ্যন্দমানমেঘমেদুরিত নীলিমা' বিদ্যাসাগরের হাতে 'আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত' হয়ে স্বরধ্বনির বিস্তারে, কোমলব্যঞ্জনের সমাবেশে ও যুক্তব্যঞ্জনের তরঙ্গাঘাতে মেঘমেদুর নীলিমার তরঙ্গ-বিস্তারকে আরও সার্থক করে তুলেছে। 'নিবিড়' শব্দযোগে যেমন গভীরতা ও ঘনত্ব এসেছে, 'অকাশপথে সততসঞ্চরমান' তেমনি ব্যাপকপরিসরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছে। 'অলঙ্কৃত' শব্দটির প্রয়োগে যেন অদৃশ্য কোনো মহাশিল্পীর আভাস থেকে গেছে। এইখানেই বিদ্যাসাগর অনুবাদক হয়েও স্বাধীন শিল্পী হয়ে গেছেন।

'সীতার বনবাস'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অনুসরণে লেখা। প্রায়ক্ষেত্রেই তিনি বিশ্বস্ত অনুবাদ করে গেছেন, তবে অনুবাদে জড়তা অস্পষ্টতা বা আড়ম্বর নেই। মনে হয় বাল্মীকির অনুসরণে বিদ্যাসাগরকে ভাষার মার্জনা কম করতে হয়েছে, কারণ ভবভূতির সমাসবদ্ধতার দীর্ঘ বেড়াজাল বাল্মীকির ভাষায় নেই :

ততো মধ্যং জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবম্॥
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী।
অপাপা হি ত্বয়া ত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ॥
লোকাপবাদভীতেন ত্বয়া রাম মহামতে।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সাধ্বী তদনুজ্ঞাতুমর্হসি॥

[ত্র্যধিক শততমঃ সর্গঃ, উত্তরকাণ্ড, রামায়ণম্, গৌড়ীয় পাঠঃ, হেমন্তকুমার-কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ-ভট্টাচার্যেন সংস্কৃতম্, ১৯৪২]

এই অংশের 'সীতার বনবাসে'র রূপান্তর হলো ঃ

> 'রাজা রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে প্রশস্ত মনে অনুমোদন প্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।'

তবে একথা ঠিক যে অনুবাদ মোটামুটি বিশ্বস্ত হলেও বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্র বাল্মীকির 'দুরাধর্ষ ক্ষত্রিয়কুলদীপ' রামচন্দ্র নন। বাল্মীকির তুলনায় 'সীতার বনবাস'-এর রাম কিছুটা ভবভূতির প্রভাবে, কিছুটা করুণাসাগর অনুবাদকের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে অনেকখানি কোমল।

আর একটি ব্যাপারে 'সীতার বনবাস' বাল্মীকিকে লঙ্ঘন করেছে। সে লঙ্ঘনের কারণ লেখকের পূর্ব-কথিত অলৌকিকতার প্রতি অনীহা। মূল রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশের যে বর্ণনা আছে বিদ্যাসাগর তাকে অলৌকিকবোধে বর্জন করেছেন। বাস্তব কারণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে পরিগ্রহ প্রতীক্ষার শেষ আলোটি যখন নিভে গেল তখন সীতা মূর্চ্ছিতা হলেন এবং পরে আর তাঁর চেতনা ফিরে এলো না। বাল্মীকির সেই বিখ্যাত বর্ণনা ঃ 'ভূতলং ভিত্ত্বা সহসা সিংহাসনমনুত্তমম্'—অমিতপ্রভ সর্পদের মস্তকধৃত সেই সিংহাসনে সীতা ধরণীর বাহুবেষ্টিতা হয়ে রসাতলে চলে গেলেন।

তারপর 'পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ।' চতুর্দিকে দেবতারা সাধু সাধু ধ্বনি তুললেন। এমন মহান, প্রত্যক্ষ ক্ল্যাসিক্যাল কবিত্বের লোভ সংবরণ ক'রে বিদ্যাসাগর শুধু লিখলেন: 'কিন্তু তাঁহার [বাল্মীকির] সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই, বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছেন।' এই একটি মাত্র বাক্যে সীতার মৃত্যু বর্ণনা যেন ট্রাজেডির সংহত মহিমা পেয়েছে। আগেই বলেছি, আধুনিক যুগ-সচেতন বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা'র অনুবাদে অপ্রয়োজনীয় অলৌকিকতাকে নির্মম ভাবে বাদ দিয়েছেন, 'সীতার বনবাসে'ও তার ব্যতিক্রম দেখি না।

॥ ঘ ॥ বিদ্যাসাগরের গদ্য ও উত্তরকাল

আমরা আগেই দেখেছি বিদ্যাসাগরের হাতে বাঙলা সাহিত্যিক গদ্য প্রথম সম্পূর্ণতা লাভ করলো। অবশ্য মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির গদ্য বঙ্কিমের হাতেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল সকলেই অনুবাদ-সাহিত্যে মন দিয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও অনুবাদ করেছেন প্রথমে। মৌলিক সাহিত্যে হাত দিয়েছেন প্রথম অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র। অনুবাদরূপে হলেও প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-রচনা প্রকাশ বিদ্যাসাগরেরই কীর্তি। বহু বিচিত্র ভাব প্রকাশে বাঙলা গদ্য যে সম্পূর্ণ সক্ষম তা প্রমাণ করে দিলেন বিদ্যাসাগর—নানান ধরণের কাহিনী ও নাটক অনুবাদ ক'রে। এই সব অনুবাদে গল্পের মাধ্যমে বিচিত্র পরিবেশ এসেছে, বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র এসেছে, বিচিত্র ভাবের উৎক্ষেপ ঘটেছে এবং সর্বত্রই যে বিদ্যাসাগর তাঁর ভাষাকে সগৌরবে চালিয়ে নিয়ে গেছেন তার প্রমাণ আমরা 'শকুন্তলা'ও 'সীতার বনবাস' অনুবাদেই পেয়ে গেছি। প্রয়োজন মতো চলতি বাগ্‌ভঙ্গি-কে আনতেও যে তিনি দ্বিধা করেন নি সেও আমরা দেখেছি, যদিও সে অবকাশ তিনি কমই পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মস্পর্শী গদ্যের গতিবেগ বিদ্যাসাগরে সর্বত্র না থাকলেও

কোথাও কোথাও যে আছে তা সখীদের সঙ্গে শকুন্তলার আলোচনায়, গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলার সংলাপে, সীতা ও রামের অসহনীয় দুঃখ-ভোগের বর্ণনায় দেখেছি। তবে এটা ঠিক যে বিদ্যাসাগর বাক্য-গঠনের ক্ষেত্রে যতখানি সতর্ক থাকতেন, বঙ্কিমের বাক্য গঠনে সেই সতর্কতা নেই। সৃষ্টির সপ্রাণ আবেগে বঙ্কিম সেই সতর্কতার পরিশ্রম চিহ্নটুকু মুছে ফেলে সাবলীল হতে পেরেছিলেন। অবশ্যই বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত সতর্কতাই বঙ্কিমের সাবলীল চলার পথ ক'রে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের পরিশ্রমের ফলে যে সমতল রাস্তা তৈরি হয়েই ছিল তাতে ভাষার জুড়িগাড়ীকে ইচ্ছা মতো হাঁকানোতে কোনো বিপদ থাকে নি। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেনঃ 'এই সংস্কৃতানুসারিণী[১] ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।' পরে কেউ পারে নি একথা না বলে বরং বলা উচিত পরে কারুর পক্ষে এই গদ্য লেখার প্রয়োজন হয় নি। কারণ, বিদ্যাসাগর বাক্যের অঙ্গসংস্থান যেভাবে

[১] বিদ্যাসাগরের ভাষারীতিতে সংস্কৃত বাক্যভঙ্গি অনুসরণই বেশি। ইংরিজি বাক্যগঠনের প্রভাব নেই বললেই চলে। এমনকি তাঁর যে সব বই ইংরিজি বই-এর ভাবানুবাদ বা সারসংকলন সে সব বই-এর ভাষাও বিস্ময়কর ভাবে ইংরিজি-প্রভাবমুক্ত। এর থেকে বুঝতে পারা যায় কত যত্নে তিনি বাঙলা বাক্য গঠনকে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্যাশ্রয়ী ক'রে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। অথচ পূর্ববর্তীদের বাক্য গঠনে ও শব্দসংস্থানে যখন উপযুক্ত যতিচিহ্নের যথেষ্ট অভাব ও অপপ্রয়োগ দেখলেন তখন ইংরিজি যতিচিহ্নকে আশ্চর্য দক্ষতায় প্রয়োগ ক'রে বাঙলা বাক্যে স্পষ্টতা ও গতির সাবলীলতা নিয়ে এলেন। পরে অবশ্য এই যতিচিহ্নের অতিপ্রয়োগ তাঁর একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঠিক ক'রে দিয়ে অভিজাত common style তৈরি করে দিলেন তাতে তৈরী ভাষা পেয়ে পরবর্তীকালের লেখকদের ব্যক্তিক প্রবণতাগুলি প্রকাশ করবার সুযোগ এসে গেল। সতর্কতার চিন্তা না থাকলেই প্রবণতার প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবেই হয়। তাই individul style-এর যুগ এসে গেলে বিত্তাসাগরের common style-এর প্রয়োজন স্বাভাবিক ভাবেই ফুরিয়েছে।

এখন ভাষারীতির ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এলো কি করে সে কথা ভেবে দেখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বলেছিলেন যে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করার জন্য যখন যেমন দরকার তখনই তেমন উপকরণ নিতে হবে, জাতিচ্যুতির আশঙ্কা করা অর্থহীন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল শুধু শব্দ ব্যবহারে নয়, ভাবনাকে ইচ্ছামতো কমিয়ে বাড়িয়ে, ছোট ক'রে দীর্ঘ ক'রে, নানা মাপের বাক্যে ধ'রে রেখে আশ্চর্যভাবে খেলাতে পারেন। তাই বিত্তাসাগরের শৃঙ্খলা, সংস্থানরীতি, শব্দরুচি সমস্ত থেকেও বঙ্কিমের ভাষায় এমন লাবণ্য এলো, যাকে বিত্তাসাগর ক্বচিৎস্পর্শ করেছেন। ছোট ছোট বাক্য আর দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য বঙ্কিমের হাতে অদ্ভুতভাবে জোড়া লেগে গেল, সংক্ষিপ্ত অবসরেও দ্যুতিময় ছবি চমক দিয়ে উঠলো, অন্তরঙ্গ বিবৃতির নিখুঁত স্বরায়ণ বা intonation এলো, বিচিত্র রূপকে বিচিত্র বিশেষণে বর্ণনা ক'রেও একটা অতৃপ্ত রোমান্টিক লোভের রেশ থেকে গেল পাঠকের মনে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১। 'কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় নবস্ফুট, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়। নির্বাস, মুদ্রিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়। সুবিকশিত, সুবাসিত, রসপূর্ণ, রৌদ্র প্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।' [দুর্গেশনন্দিনী]

২। 'ফুলের ছড়াছড়ি, আতর গোলাপের ছড়াছড়ি, নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তস্বরের আরোহণ-অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয় কামিনী-করতল-কলিত তালের চট-চটা; মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষে-বহ্নি-প্রবাহ ; খিচুড়ি পোলাওয়ের রাশি রাশি ; বিকট, কপট, মধুর, চতুর, চতুর্বিধ হাসি ; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি, হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, একার ঝন্ঝনি, শকটের ঘ্যান্ঘ্যানানি।' [রাজসিংহ]

দুটি উদাহরণেই লক্ষণীয় যে বিদ্যাসাগরের মতো সমায়তনের দীর্ঘ বাক্যসংস্থান প্রায়শঃই নেই। বর্ণনার টানে বাক্য কখনো দীর্ঘ, কখনো ছোট। আর বর্ণনার মধ্যেও বিশেষতঃ প্রথমটিতে এমন এক রোম্যান্টিক প্রতিভা কাজ করছে যা নানাভাবে বস্তুকে বিশেষিত ক'রে তৃপ্তি পায় না, কখনো বা আশ্চর্যভাবে নিখুঁত ধ্বনিসঙ্গীতে দৃশ্যকে চোখের সামনে ধরে দেয়। আর বিশেষতঃ দ্বিতীয় উদাহরণে ছোট বাক্য, বড় বাক্য, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দ, একক শব্দ, গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দ আর একেবারেই মৌখিক অনুকার শব্দ মিলে মিশে বিদ্যাসাগরের অভিজাত সতর্ক পদক্ষেপের শীতল স্নিগ্ধতাকে সরিয়ে ভাবনার ক্ষিপ্র গতিকে, দৃশ্যের মৌতাতকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিদ্যাসাগরের ভাষায় রূপ আছে, আভিজাত্য আছে, এবং সেইজন্য মনে হয় একটু দূরবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় রূপের চটক আছে, নেশা ধরায়, কাছে টানে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথা মনে পড়েঃ 'অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।' শব্দ প্রয়োগের এ জাদুশক্তিতেই বঙ্কিমের তীব্র individuality-র প্রকাশ। এই ব্যক্তিত্ব 'কাদম্বরী'র অনুবাদক তারাশঙ্কর তর্করত্নের ছিল না, 'পৌলবর্জিনী'র অনুবাদক কৃষ্ণকমলের ছিল না, 'রোম্যান্স অব্ হিস্ট্রি'র অনুবাদক ভূদেবেরও[১] নয়। এঁদের

[১]এই প্রসঙ্গে ভূদেবের গদ্যরীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির তুলনা করা যেতে পারে। যদিও বিদ্যাসাগরের সতর্ক অভিজাত গদ্যরীতির পথেই ভূদেবের আবির্ভাব, তবু বিদ্যাসাগরের ভাষার শব্দচয়নে যে সূক্ষ্ম শ্রুতি কাজ করে, যে ধ্বনিসঙ্গীত রণিত হয়, ভূদেবের ভাষায় তা পাওয়া যায়

তিনজনের ভাষায় যে রোম্যান্টিকতা তা মূলের রোম্যান্টিক আবেশ থেকেই সংক্রামিত। আসলে এঁরা তিনজনেই বিদ্যাসাগরের common style-এর পন্থী। আভিজাত্য থেকে এঁরা স্খলিত হতে চাননি। কিন্তু বঙ্কিম আলালী ভাষার প্রেরণা পেয়েই এমন এক অসতর্ক অথচ বলিষ্ঠ, দ্রুত গতিশীল এবং চমকপূর্ণ গদ্য সৃষ্টি করলেন যাতে জীবনের বিচিত্র অথচ গাঢ় আস্বাদ পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম।

॥ ৬ ॥ শিল্পী বিদ্যাসাগর : রূপের মার্জনা

"বাঙলা গদ্যের জনক ও বিদ্যাসাগর" আলোচনায় বিদ্যাসাগরকে বলেছি 'নিয়তসচেতন শিল্পী'। বলেছি তিনিই প্রথম 'সংহত গদ্যশিল্প' সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' বই দুটির দু-টি বিভিন্ন সংস্করণের তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে কীভাবে

না : বিদ্যাসাগরের ভাষার শব্দঝঙ্কার সাধারণত আতিশয্যমুক্ত। অনুপ্রাসের বাহুল্য নেই তা নয়, তবে তা সাধারণতঃ কোমল ধ্বনি-নির্ভর; কিন্তু প্রয়োজনমতো কর্কশধ্বনিকেও বেছে নেয় এবং অনেক সময়েই ব্যঞ্জনাবাহী। ভূদেবের ভাষায় সূক্ষ্মশ্রুতির পরিচয় নেই, ভাষার সঙ্গীত নেই; অনুপ্রাসের বাহুল্য তো আছেই এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা কর্কশধ্বনি নির্ভর, এমন কি আলঙ্কারিক মোহে আচ্ছন্ন। 'একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল', 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র এই ধ্বনিসঙ্গীত ভূদেবের 'সফল স্বপ্ন'-এর 'ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর-বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন'-এর মধ্যে অবশ্যই নেই। প্রবন্ধের ভাষাতেও বিদ্যাসাগর স্পষ্টতা, যুক্তিশৃঙ্খলা ও সংযমের সঙ্গে এই সূক্ষ্মশ্রুতিকে বজায় রেখে চলেছেন। কিন্তু ভূদেবের ভাষায় প্রাবন্ধিকের স্পষ্টতা যুক্তিশৃঙ্খলা, তথ্যনিষ্ঠা ইত্যাদি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণ আছে, কেবল সঙ্গীতধ্বনিটি নেই।

তিনি নিয়তসচেতন শিল্পী-মন নিয়ে বারবার রচনার মার্জনা ক'রে, বাক্যকে সহজ করেছেন। বাক্যের অন্তর্লীন পদক্ষেপকে ছোট ক'রে, তার ছন্দস্রোতকে আরও নিয়মিত ক'রে এবং শব্দকে সেই রুচিকর ধ্বনিময়তার খাতিরে প্রয়োজন মতো বদলে গদ্যশিল্পে সংহতি আনতে পেরেছিলেন।

'শকুন্তলা'র তিনটি সংস্করণ তুলনার জন্য ব্যবহার করছি। প্রথমটি ১৮৭৫ সালের একাদশ সংস্করণ। এর দুটি আখ্যাপত্র আছে। প্রথমটি ইংরেজি। দ্বিতীয়টি বাঙলা। ইংরেজি আখ্যাপত্রটি হলো: A/Tale/From/The Sukuntala of Kalidasa/by/ IswarchandraVidyasagara/Eleventh edition/Calcutta/ Published by the Sanskrit Press Depository/No. 30 Bechoo Chatterjee's Street./1875. বাঙলা আখ্যাপত্রটি হলো: 'শকুন্তলা/কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের/ উপাখ্যান ভাগ/শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত। একাদশ সংস্করণ/কলিকাতা/ সংস্কৃত যন্ত্র। / সংবৎ ১৯৩১।' দ্বিতীয় বইটি চতুর্দশ সংস্করণ। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তল' বইটিতে এই পাঠই গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় বইটি ১৮৯৭ সালের পঞ্চদশ সংস্করণ। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরেকার সংস্করণ। চতুর্দশ সংস্করণের সঙ্গে এই পঞ্চদশ সংস্করণের সামান্য কয়েকটি চিহ্ন ছাড়া পার্থক্য নেই। পঞ্চদশ সংস্করণ যেহেতু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চতুর্দশ সংস্করণেই বিদ্যাসাগরের শেষ সংশোধনের কাজ রয়েছে। তাই চতুর্দশ সংস্করণের পাঠই এখানে গৃহীত হলো। পঞ্চদশ সংস্করণে কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্বোধন চিহ্ন সরিয়ে কমা দিয়ে সে কাজ সারা হয়েছে। হয়তো চতুর্দশ সংস্করণের প্রকাশিত পাঠে বিদ্যাসাগর এই সংশোধনের কাজ করে রেখেছিলেন। পঞ্চদশ সংস্করণে কেবল একটি আখ্যাপত্র আছে: 'শকুন্তলা/কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল

নাটকের উপাখ্যান ভাগ/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত। / পঞ্চদশ সংস্করণ। /কলিকাতা /আনন্দমঠ প্রেস। /সংবৎ ১৯৫৪। /Published by the Calcutta Library / No. 25 Sukeas' Street, Calcutta. / 1897.

'সীতার বনবাস'-এর প্রথমটি ১৮৭৯ কিংবা ১৮৮০ সালের, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের জীবৎ-কালের সংস্করণ। এর আখ্যাপত্রটি হলো: 'সীতার বনবাস / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত। / উনবিংশ সংস্করণ। / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্র। / সংবৎ ১৯৩৫।' দ্বিতীয়টি ১৮৯০ সালে প্রকাশিত পঞ্চবিংশ সংস্করণ। এটিই বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'সীতার বনবাস'-এ এই সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে। আমরাও এই পাঠ গ্রহণ করলাম। তৃতীয়টি ১৮৯৭ সালের সংস্করণ। এটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ: 'সীতার বনবাস/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত। /সপ্তবিংশ সংস্করণ। / কলিকাতা /আনন্দমঠ প্রেস। / সংবৎ ১৯৫৪/ Published by the Calcutta Library, / No 25, Sukeas' Street, Calcutta, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরেকার সংস্করণ এটি। বলা বাহুল্য এর সঙ্গে পঞ্চবিংশ সংস্করণের কোনো প্রভেদ নেই।

প্রথমে 'শকুন্তলা'র উল্লিখিত তিনটি (প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংস্করণে কোনো পার্থক্য নেই) সংস্করণের তুলনা করা যাক। একাদশ সংস্করণের শেষ অনুচ্ছেদটির উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

> 'পরে, কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া, উত্তরকালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ

প্রদানার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস ! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক, পত্নীপুত্রসমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।'

চতুর্দশ বা পঞ্চদশ সংস্করণে এই অনুচ্ছেদটির পরিবর্তিত রূপ হলো নিম্ন-প্রকার ঃ

পরে, কশ্যপ, রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বৎস। তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং, সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া, উত্তরকালে, ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যখন এ বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কিনা সম্ভবিতে পারে ? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে, কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ-প্রদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস ! বহু দিবস হইল, রাজধানী হইতে আসিয়াছ ; অতএব, আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক, পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে, প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক, সপুত্র, রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, পরম সুখে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।'

এই দুই অংশের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক। প্রথম বাক্যটিতে পূর্বসংস্করণের তুলনায় তিনটি কমা বেশি বসেছে ['কশ্যপ', 'এবং', 'উত্তরকালে' এই তিনটি শব্দের পর]। চতুর্থ বাক্যে চারটি নতুন কমা ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ক্ষেত্রে কমা সরিয়ে সেমিকোলনের ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া 'পত্নীপুত্রসমভিব্যাহারে' এই সমাসবদ্ধ পদটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম বা শেষ বাক্যে চারটি নতুন কমা ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চদশ সংস্করণে 'বৎস', 'ভগবন্' ইত্যাদি সম্বোধনের পর কমা আছে।

যাই হোক, এই পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সমস্ত কমা ব্যবহার করা হয়েছে তার অভাবে অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটবে বলে তা করা হয় নি, করা হয়েছে বাক্যকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ ক'রে পড়বার জন্য, বাক্যের মেরুদণ্ডকে সর্বজনবোধ্য করবার জন্য এবং প্রত্যেকটি বিরামকে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিহ্নিত করবার জন্য। যেখানে কমা সরিয়ে সেমিকোলন আনা হয়েছে সেখানে প্রকৃতপক্ষে বাক্যে শেষ হয়ে গেছে অথচ বক্তব্য শেষ হয় নি বলে 'অতএব' দিয়ে পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে। কাজেই স্থিরতর চিন্তায় এখানে কমার চেয়ে দীর্ঘতরকালের বিরতি-জ্ঞাপক চিহ্ন সেমিকোলন যুক্তিযুক্তই হয়েছে। আর সমাস ভাঙার উদ্দেশ্য যে সরলতা আনবার চেষ্টা তা অত্যন্ত স্পষ্ট। কাজেই বিদ্যাসাগর নতুন নতুন সংস্করণে যে পরিবর্তন এনেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল যতি-পতনের সূক্ষ্ম ভেদগুলিকে চিহ্নিত ক'রে বাক্য গঠনে সুশৃঙ্খলা নিয়ে আসা এবং ভাষায় সরলতা সম্পাদন করা। অন্যত্র কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষ উক্তিগুলিতে ঊর্ধ্ব কমা দিয়েছেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় প্রয়োজনে। যেমন সপ্তম পরিচ্ছেদে কশ্যপের উক্তি :

একাদশ সংস্করণ :

> তিনি তাহাতে কুপিত হইয়া, তোমায় এই শাপ দিয়া চলিয়া যান, তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনো তোরে স্মরণ করিবেক না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই।

পঞ্চদশ সংস্করণ :

> তিনি, কুপিত হইয়া, তোমায় এই শাপ দিয়া চলিয়া যান, "তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনও তোরে স্মরণ করিবেক না।" তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই।

এক্ষেত্রে একজনের উক্তির মধ্যে অন্যের উক্তি মিশে আছে বলে অন্যের উক্তিকে ঊর্ধ্বকমার মধ্যে বিশিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। চতুর্দশ সংস্করণে এই পরিবর্তন করা হয় নি। এই রকম সমস্যা

ছাড়া প্রত্যক্ষ উক্তিকে বিদ্যাসাগর সাধারণতঃ ঊর্ধ্বকমার মধ্যে রাখেন নি। আর একটি স্থানে দাঁড়ি তুলে দিয়ে সেমিকোলনের সার্থক ব্যবহারের প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

একাদশ সংস্করণ ঃ

> এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যান নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।

চতুর্দশ, পঞ্চদশ সংস্করণ ঃ

> এই নিমিত্ত, আমি সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি ; শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যান নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।

পূর্ববর্তী বাক্য শেষ হলেও ভাব বা বক্তব্য শেষ হয় নি। সেই কথা ভেবে দাঁড়ি সরিয়ে সেমিকোলন বসানো হয়েছে।

বহুক্ষেত্রেই পূর্বসংস্করণের পুনরাবৃত্তি দোষকে এড়াবার চেষ্টা বিদ্যাসাগর করেছেন। 'সীতার বনবাস'-এর অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি।

ঊনবিংশ সংস্করণ ঃ

> তিনি আশার উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল অবস্থা ঘটিতে পারে, তিনি সে সমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বাস্তবঘটনাকালে সেই সমস্ত অবলোকন করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না।

পঞ্চবিংশ, সপ্তবিংশ সংস্করণ ঃ

> তিনি আশার উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন ; রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না ;...

দেখা যাচ্ছে 'এবং বাস্তব ঘটনা জ্ঞানে……লাগিলেন' পর্যন্ত বাক্যাংশ পরে বাদ দিয়েছেন। বাদ দেওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে, 'চিত্রপটে চিত্রিত' বলার পর আবার 'বাস্তব ঘটনা জ্ঞানে সেই সমস্ত অবলোকন' করার ব্যাপারটাতে পুনরাবৃত্তিদোষ এসে যায়।

শব্দ পরিবর্তন বিশেষ দেখা যায় না। মনে হয় শব্দনির্বাচনে তাঁর তীক্ষ্ণ শ্রুতিক্ষমতা প্রায়ক্ষেত্রেই প্রথম নির্বাচনকেই শেষ নির্বাচন করে তুলতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের ঝোঁকে কিছু কিছু বদল চোখে পড়ে। যেমন 'কহিলেন' স্থানে পরবর্তী সংস্করণে 'বলিলেন' লিখেছেন, অবশ্য সর্বত্র নয়। 'আজি' হয়েছে 'আজ'। 'লাভ করেন' স্থানে 'পাইয়াছিলেন'। প্রদান করিয়াছিলেন' স্থানে 'দিয়াছিলেন'। অনেক সময়ে ক্রিয়াপদের শেষে যে 'ক' ব্যবহার করতেন, পরে তাও বর্জন করেছেন। যেমন 'আশ্রয় করিবেক' স্থানে 'আশ্রয় গ্রহণ করিবে।' অনেক সময় 'অবলোকন' ক্রিয়াপদটিকে বদলেছেন। যেমন 'সীতার বনবাস'-এর ঊনবিংশ সংস্করণে আছে : 'এদিকে মিথিলা বৃত্তান্ত অবলোকন করুন।' সপ্তবিংশ সংস্করণে আছে : 'এদিকে মিথিলা বৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন।' বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অর্থ 'অবলোকন' শব্দে প্রকাশিত হয় না ভেবেই 'দৃষ্টিপাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শকুন্তলার একাদশ সংস্করণে রয়েছে : 'এই বলিয়া, তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা অনিমিষ নয়নে তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।' চতুর্দশ বা পঞ্চদশ সংস্করণে পরিবর্তিত রূপ পাচ্ছি : 'এই বলিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা অনিমিষ নয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' আড়াল থেকে তপস্বী কন্যাদের যৌবনমাধুরী দেখবার ইচ্ছা তীব্র বলেই 'অবলোকন' শব্দের পরিবর্তে 'নিরীক্ষণ' শব্দের দ্বারা 'খুঁটিয়ে দেখা' অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অনেক সময় মূলানুগ না ক'রে স্বচ্ছন্দ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী সংস্করণে। শকুন্তলার একাদশ সংস্করণে রয়েছে : 'মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত, ইহাকে সাদর

মনে সেচন ও সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।' চতুর্দশ বা পঞ্চদশ সংস্করণে দেখছি: 'মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত, উহাকে ['সতত': পঞ্চদশ সংস্করণ] সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।'

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংস্করণগুলির তুলনা করলে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ভাষাকে সহজ, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ করা। শব্দকে তিনি অর্থানুযায়ী ও রুচিসম্মতভাবে নির্বাচিত করেছেন, বাক্যকে সতর্ক প্রহরীর মতো প্রতি পদক্ষেপে যতিচিহ্ন সহকারে এগিয়ে নিয়ে পূর্ণযতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। সহজবোধ্য রুচিকর গদ্যকে তিনি আদর্শ করেছেন বলেই বাক্যকে প্রলম্বিত করেন নি, সমাসবদ্ধতা থেকে ক্রমশঃ মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই অতিরিক্ত সতর্কতায় কখনো ব্যক্তিক রীতি বা individual style গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু সার্বজনীন রীতি বা common style গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যক্তিচেতনাকে [অর্থাৎ বিভিন্ন যতিচিহ্ন প্রয়োগের চেতনা, তাদের পরস্পরের পার্থক্য অনুযায়ী ব্যবহার, শব্দনির্বাচনে সুরুচি, জটিল বাক্যভার থেকে মুক্ত থাকবার চেষ্টা ইত্যাদি] সজাগ রেখে বিদ্যাসাগর গদ্যের রাজপথ তৈরি করে গেছেন।

শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার

শকুন্তলা

[প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ ডিসেম্বর]

কালিদাসপ্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উপাখ্যানভাগ

[১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্দশ সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূলগ্রন্থের অলৌকিক-চমৎকারিত্বসন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং, সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট, কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের এই রূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, কত শত বার, আমায় তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ, বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঠকবর্গ! বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কলেজ।
২৫এ অগ্রহায়ণ। সংবৎ ১৯১১।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

'অতি পূর্ব্বকালে, ভারতবর্ষে, দুষ্মন্ত নামে সম্রাট্ ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে[1], মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুত বেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি, শুনিয়া, অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায়, রশ্মি সংযত করিয়া, রথের বেগসংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।'

এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার[2] করুন। আপনকার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।

রাজা, লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ, সংহিত[3] শরের প্রতিসংহরণপূর্ব্বক, প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ

[1] সঙ্গে লইয়া। [2] নিবারণ। [3] ধনুকে জোতা

করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে। প্রার্থনা করি, আপনকার পুত্রলাভ হউক, এবং সেই পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন। রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

অনন্তর, তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ! ঐ মালিনী নদীর তীরে, আমাদের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে; যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথিসৎকার স্বীকার করুন। আর, তপস্বীরা, কেমন নির্ব্বিঘ্নে, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে, ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন, না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই; এইমাত্র, স্বীয় তনয়া শকুন্তলার হস্তে অতিথিসৎকারের ভারার্পণ করিয়া, তদীয় দুর্দৈবশান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থ প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আমি, অবিলম্বে, তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া, আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন, সূত! রথচালন কর, তপোবনদর্শন দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি, ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্ব্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়ৎ দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার[১] সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল[২] ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ, কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল, নিঃশঙ্ক চিত্তে, চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে, নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।

---

[১] তৃণধান্য। [২] যেড়ীফল।

রাজা, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; অতএব, এইখানেই রথ রাখ, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, তিনি স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব, শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া, রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে ন্যস্ত করিলেন, এবং কহিলেন, অশ্বগণের আজ অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, আশ্রমবাসীদিগের দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, উহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া, রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবা মাত্র, তদীয় দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ শান্তরসাস্পদ[১], অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রিয়সখি! এ দিকে, এ দিকে; এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার[২] দক্ষিণাংশে, যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে; কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্পবয়স্কা তপস্বিকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে[৩] জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা, তাঁহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী, ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে

১ পবিত্র ভাবযুক্ত। ২ বাগানবাড়ী, এখানে গাছপালা দিয়ে ঘেরা জায়গা।
৩ গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার জন্য আল দেওয়া গোল খাত।

নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্য্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া, তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা, অনিমিষ নয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত, বৃক্ষ-বাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া, পরিহাস করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে[১] তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে, যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, আইস, তাহাদিগের সেচন করি। অনন্তর, সকলে মিলিয়া, সেই সমস্ত বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা দেখিয়া শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক; এমন শরীরে, কেমন করিয়া, বল্কল[২] পরাইয়াছেন। অথবা, যেমন, প্রফুল্ল কমল, শৈবলযোগেও বিলক্ষণ শোভা পায়; যেমন, পূর্ণ শশধর, কলঙ্কসম্পর্কেও, সাতিশয় শোভমান হয়; সেইরূপ, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, বল্কল পরিধান করিয়াও, যার পর নাই, মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে।

শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে, সম্মুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, সখী-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে, সহকারতরুর[৩] নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে,

[১]আশ্রমের গাছপালাগুলিকে। [২]গাছের ছাল দিয়ে তৈরী পোষাক। [৩]আম গাছ।

যেন সহকার, অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা, আমায় আহ্বান করিতেছে; অতএব, আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া, তিনি, সহকারতরুতলে গিয়া, দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি! ঐখানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্ত্তিনী[১] হওয়াতে, যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এই জন্যেই, তোমায় সকলে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাসশ্রবণে, সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপের[২] বিচিত্র শোভায় বিভূষিত, আর, নব যৌবন, বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন, শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে, স্বয়ংবরা হইয়া, সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, বনতোষিণীর নিকটে গিয়া, সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, সখি অনসূয়ে! দেখ, ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা, বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে, আর, সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি জন্যে, শকুন্তলা, সর্ব্বদাই, বনতোষিণীকে উৎসুকনয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি! জানি না; কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে, বনতোষিণী যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন, সেইরূপ, আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন, এটি তোমার আপনার মনের কথা।

[১] নিকটবর্ত্তিনী। [২] তরু

শকুন্তলা, এই বলিয়া, অনতিদূরবর্ত্তিনী[১] মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত, মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! আমিও তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শিত করিয়া, কহিলেন, এ তোমার, মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাই না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি, তাই বলিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম,[২] এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে! এই জন্যেই, শকুন্তলা মাধবীলতায়, এতাদৃশ যত্নসহকারে, জলসেচন ও উহার প্রতি এতাদৃশ স্নেহপ্রদর্শন করে। শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত, উহাকে সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া, শকুন্তলা মাধবীলতার জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেক করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম ভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লবসঞ্চালন দ্বারা, নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া, অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন, শকুন্তলা, একান্ত অধীরা হইয়া, কহিতে লাগিলেন, সখি! পরিত্রাণ কর,[৩] দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন, উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি; দুষ্যন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। উত্তরোত্তর ভ্রমর অধিকতর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, শকুন্তলা কহিলেন, দেখ, এই দুর্বৃত্ত কোনও মতে, নিবৃত্ত হইতেছে না; আমি এখান হইতে যাই।

[১] সামান্য কিছু দূরের। [২] কুঁড়ি বাহির হওয়া। [৩] রক্ষা কর।

এই বলিয়া, দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, কি আপদ্! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর। তখন তাঁহারা পুনর্বার কহিলেন, প্রিয়সখি! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি; দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু, রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি করি। অথবা, অতিথিভাবে উপস্থিত হইয়া, অভয় প্রদান করি। এই স্থির করিয়া, রাজা, সত্বরগমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, কহিতে লাগিলেন, পুরু-বংশোদ্ভব দুষ্মন্ত দুর্ব্বৃত্তদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য, মুগ্ধস্বভাবা তপস্বিকন্যাদিগের সহিত, অশিষ্ট ব্যবহার করে।

তপস্বিকন্যারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে, অনসূয়া কহিলেন, না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্টঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক দুষ্ট মধুকর আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছিল, তাহাতেই ইনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, নির্ব্বিঘ্নে তপস্যাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে? শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, হাঁ মহাশয়! নির্ব্বিঘ্নে তপস্যাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; এক্ষণে, অতিথি-বিশেষের সমাগমলাভ দ্বারা, সবিশেষ সম্পন্ন হইল। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! যাও, যাও, শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া আইস; জল আনিবার প্রয়োজন নাই; এই কলসে যে জল আছে, তাহাতেই প্রক্ষালনক্রিয়া[১] সম্পন্ন

---

[১] হাত পা মুখ ধোয়ার কাজ।

হইবেক। রাজা কহিলেন, না, না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না; মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই, আতিথ্যক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তখন অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! তবে, এই শীতল সপ্তপর্ণবেদীতে উপবেশন করিয়া, শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন, তোমরাও, জলসেচন দ্বারা, অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধরক্ষা করা উচিত; এস, আমরাও বসি। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলেন।

এই রূপে, সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচার করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে? এই বলিয়া তিনি, তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকা হইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদের সমান রূপ, সমান বয়স, সমান ব্যবসায়; সেই নিমিত্ত, তোমাদের সৌহৃদ্য সাতিশয় রমণীয় হইয়াছে। প্রিয়ংবদা, রাজার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! এ ব্যক্তি কে? দেখ, কেমন সৌম্যমূর্ত্তি, কেমন গম্ভীরাকৃতি, কেমন প্রভাবশালী! একান্ত অপরিচিত হইয়াও, মধুর আলাপ দ্বারা, চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায়, প্রতীতি জন্মাইতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমারও এ বিষয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার মধুর আলাপ শ্রবণে সাহসিনী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তেই বা, এরূপ সুকুমার হইয়াও, তপোবনদর্শন পরিশ্রম স্বীকার করিযাছেন? শকুন্তলা, শুনিয়া, মনকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, হৃদয়! এত উতলা হও কেন? তুমি যে জন্যে ব্যাকুল হইতেছ, অনসূয়া সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি

রূপে আত্মপরিচয় দি ; যথার্থ পরিচয় দিলে, সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই বলিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্ম্মাধিকারে[১] নিযুক্ত ; পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে, এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন, অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য ; মহাশয়ের সমাগমে, তাঁহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কিন্তু, পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই চিত্ত চঞ্চল হইল ; এবং, উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে, চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে, শকুন্তলাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! যদি আজ পিতা আশ্রমে থাকিতেন, জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুন্তলা, শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা, কিছু মনে করিয়া, এই কথা বলিতেছ ; আমি তোমাদের কথা শুনিতে চাই না।

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি, তোমাদের সখীর বিষয়ে, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি। তাঁহারা কহিলেন, মহাশয়! আপনকার এ অভ্যর্থনা অনুগ্রহবিশেষ ; যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, মহর্ষি কণ্ব কৌমারব্রহ্মচারী,[২] ধর্ম্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত ; জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই ; অথচ, তোমাদের সহচরী তাঁহার তনয়া, ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া, অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা প্রিয়সখীর জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শুনিয়া থাকিবেন, বিশ্বামিত্র নামে এক অতি প্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন। তিনি, একদা, গোমতী নদীর তীরে, অতিকঠোর তপস্যা

[১]বিচারপতির কাজে। [২]কুমার এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারী।

করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত, মেনকানাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা, তদীয় তপস্যাস্থানে উপস্থিত হইয়া, মায়াজাল বিস্তৃত করিলে, মহর্ষির সমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা আমাদের সখীর জনক ও জননী। নির্দয়া মেনকা, সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের সখী, সেই বিজন বনে, অনাথা পড়িয়া রহিলেন। এক শকুন্ত,[১] কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন-পূর্ব্বক, আমাদের সখীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে, তাত কণ্ব, পর্য্যটনক্রমে, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের আবির্ভাব হইল। তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় তনয়ার ন্যায়, লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং প্রথমে শকুন্ত লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত, নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, হাঁ, সম্ভব বটে; নতুবা, মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে, কখনও, জ্যোতির্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে, বোধ হইতেছে, যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন। শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে লক্ষ্য করিয়া, ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা, তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ; তোমাদের সখীর বিষয়ে, আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

[১] শকুনী জাতীয় পাখী।

রাজা কহিলেন, আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ পর্য্যন্ত মাত্র, তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া চলিবেন, অথবা, যাবজ্জীবন হরিণীগণ সহবাসে, কালহরণ করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন, তাত কণ্ব সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, অনুরূপ পাত্র না পাইলে, শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তবে আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। হৃদয়! আশ্বাসিত হও, এক্ষণে সংশয়ের নিরাকরণ[১] হইয়াছে; এই সুখস্পর্শ শীতল রত্ন; ইহাকে প্রদীপ্ত অগ্নি ভাবিয়া, আর শঙ্কিত হইবার আবশ্যকতা নাই।*

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! আমি চলিলাম; আর আমি এখানে থাকিব না। অনসূয়া কহিলেন, সখি! কি নিমিত্তে? শকুন্তলা বলিলেন, দেখ, প্রিয়ংবদা, যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে; আমি আর্য্যা গোতমীর নিকট গিয়া, এই সকল কথা বলিব। অনসূয়া কহিলেন, সখি! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত পরিচর্য্যা করা হয় নাই। বিশেষতঃ, আজ তোমার উপর অতিথিপরিচর্য্যার ভার আছে। অতএব, ইঁহারে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা, কিছু না বলিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন।* তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে আটকাইয়া কহিলেন, সখি! তুমি যাইতে পাইবে না। আমার এক কলসী জল ধার; আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব। শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, ঋণপরিশোধের নিমিত্ত, কলসী লইয়া, জল আনিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, তাপসকন্যে! তোমার সখী, বৃক্ষসেচন দ্বারা, অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন*; আর উঁহাকে, পল্বল[২] হইতে জল আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত করা উচিত হয় না। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্ত করিতেছি। এই বলিয়া, রাজা, স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া, জলকলসের মূল্যস্বরূপ, প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

---

[১] দূর। [২] ছোট জলাশয়।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা অঙ্গুরীয় রাজকীয় নামাক্ষরে অঙ্কিত দেখিয়া, চকিত হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীয়ে দুষ্যন্তনাম মুদ্রিত আছে, অর্পণসময়ে রাজার তাহা মনে ছিল না। এক্ষণে, তিনি, আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা দর্শনে, সাবধান হইয়া কহিলেন, রাজকীয় নামাক্ষর দেখিয়া, তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ; রাজা আমায়, প্রসাদচিহ্নস্বরূপ,[১] এই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছেন। প্রিয়ংবদা, রাজার ছল বুঝিতে পারিয়া, সহাস্য বদনে, কহিলেন, মহাশয়! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীবিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে; আপনকার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্ত হইলেন; পরে, ঈষৎ হাসিয়া, শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সখি শকুন্তলে! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ, তোমায় ঋণে মুক্ত করিলেন; এক্ষণে, ইচ্ছা হয়, যাও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে; অনন্তর প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি যাই, না যাই, তোমার কি?

রাজা, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ইহার প্রতি যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, আর সন্দেহের বিষয় কি? আমার সহিত কথা কহিতেছে না; অথচ, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্ত হইয়া, স্থির কর্ণে শ্রবণ করিতেছে; নয়নে নয়নে সঙ্গতি[২] হইলে, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইতেছে; অথচ, অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না। অন্তঃকরণে অনুরাগ সঞ্চার না হইলে, কামিনীদিগের কদাচ এরূপ ভাব হয় না।✓

রাজা ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে; এমন সময়ে, সহসা, অনতিদূরে, অতি মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল; এবং কেহ কহিতে লাগিল, হে তপস্বিগণ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, তপোবন সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা, আশ্রমস্থিত প্রাণিসমূহের রক্ষণার্থে সত্বর ও যত্নবান্ হও;

[১] অনুগ্রহ চিহ্ন হিসাবে। [২] চোখে চোখ পড়িলে।

বিশেষতঃ, এক আরণ্য হস্তী, রাজার রথদর্শনে নিরতিশয় চকিত হইয়া, তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ, ধর্ম্মারণ্যে[১] প্রবেশ করিতেছে।

তাপসকন্যারা, শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কাকুল হইলেন। রাজা, বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আপদ্! অনুযায়ী লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, তপোবনের পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে, সত্বর নিবারণ করা আবশ্যক। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, মহারাজ! আরণ্য গজের উল্লেখ শুনিয়া, আমরা অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি; অনুমতি করুন, কুটীরে যাই। রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনের পীড়া-পরীহারের[২] নিমিত্ত চলিলাম। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন, মহারাজ! যেন পুনরায় আমরা আপনকার দর্শন পাই। সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই; এজন্য আমরা অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন, না, না; তোমাদের দর্শনেই, আমার যথেষ্ট সৎকারলাভ হইয়াছে।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পা চলিয়া, ছল করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা পদতল ক্ষত হইয়াছে; এজন্য আমি শীঘ্র চলিতে পারিতেছি না; আর, আমার বল্কল কুরবক-শাখায় লাগিয়া গিয়াছে; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া, বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলা, সতৃষ্ণ নয়নে, রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া, আর আমার নগরগমনে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অতএব, তপোবনের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশিত করি। কি আশ্চর্য্য! আমি, কোনও মতেই, আমার চঞ্চল চিত্তকে শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।

[১] ধর্ম্মাচরণ করিবার অরণ্য বা তপোবন। [২] গণ্ডগোল দূর করিবার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মৃগয়ায় আগমনকালে, স্বীয় প্রিয়বয়স্য[১] মাধব্যনামক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কালযাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন,[২] বসন, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ হইলে, তাহাদের একান্ত অসহ্য হয়। মাধব্য, রাজধানীতে, অশেষবিধ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেন। অরণ্যে সে সকল সুখভোগের সম্পর্ক ছিল না; প্রত্যুত,[৩] সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এক দিবস, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মাধব্য মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া, প্রাণ গেল। প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দূল, এই করিয়া, মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত, বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে, পল্বল ও বননদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে, তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে, অতিশয় কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে, সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই, আহার করিতে হয়। আহারসামগ্রীর মধ্যে, শূল্য মাংসই[৪] অধিকাংশ; তাহাও প্রত্যহ প্রকৃতরূপ পাক করা হয় না। আর, প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে, রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু, ব্যাধগণের বনগমনকোলাহলে, অতি প্রত্যূষেই, নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি

---

[১] প্রিয় বন্ধু; সংস্কৃত সাহিত্যে রাজ-বিদূষকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।
[২] ভোজন। [৩] পরন্তু। [৪] পোড়া মাংস।

না। সে দিবস, আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, রাজা, একাকী, এক মৃগের অনুসরণক্রমে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ শকুন্তলানাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি, নগরগমনের কথা আর মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, এক বারও চক্ষু মুদি নাই।

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজা, মৃগয়ার বেশধারণ পূর্ব্বক, তৎকালোচিত সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকে আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন, বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকি; তাহা হইলেও, যদি আজ বিশ্রাম করিতে পাই। এই বলিয়া, মাধব্য, ভগ্নকলেবরের ন্যায়, একান্ত বিকল হইয়া রহিলেন; পরে, রাজা সন্নিহিত হইবা মাত্র, সাতিশয় কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য! আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আছে; হস্ত প্রসারিত করি, এমন ক্ষমতা নাই; অতএব, কেবল বাক্য দ্বারাই, আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন, কেন হইল কি আবার, স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়া, অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজা কহিলেন, বয়স্য! বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। মাধব্য কহিলেন, নদীতীরবর্তী বেতস যে কুব্জভাব অবলম্বন করে, সে কি স্বেচ্ছা বশতঃ সেইরূপ করে, অথবা নদীর বেগ-প্রভাবে? রাজা কহিলেন, নদীর বেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন, তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের[১]। রাজা কহিলেন, সে কেমন? মাধব্য কহিলেন, আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বনচরের ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক, নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান; সর্ব্বদা,

---

[১] দেহের বিকলতা; এখানে গায়ের ব্যথা অর্থে ব্যবহৃত

তোমার সঙ্গে সঙ্গে, মৃগের অন্বেষণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, অন্ততঃ, এক দিনের মত, আমায় বিশ্রাম করিতে দাও।

রাজা, মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কহিতেছে; আমারও, শকুন্তলাদর্শন অবধি, মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি না; তাহাদের মঞ্জুল নয়ন,[১] নয়নগোচর হইলে, শকুন্তলার অলৌকিক বিভ্রমবিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে। মাধব্য রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন, ইনি আর কিছু ভাবিতে লাগিলেন, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিলেন, না হে না, আমি অন্য কিছু ভাবিতেছি না; সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, আজ মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব্য, শ্রবণ মাত্র, যার পর নাই আনন্দিত হইয়া, চিরজীবী হও বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! যাইও না, আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য, কী কথা বল বলিয়া, শ্রবণোন্মুখ হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোনও অনায়াস-সাধ্য কর্ম্মে আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন, বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবেক না, মিষ্টান্নভক্ষণে; সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটে, অনায়াসেই সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে পারিব। রাজা কহিলেন, না হে না, আমি যা বলিব। এই বলিয়া, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, রাজা সেনাপতিকে আনিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন।

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি, অনতিবিলম্বে, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং, মহারাজের

১ সুন্দর চোখ।

জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ায় চলুন। রাজা কহিলেন, আজ মাধব্য মৃগয়ার দোষকীর্ত্তন করিয়া, আমায় নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেনাপতি, রাজার অগোচরে, অনুচ্চ স্বরে, মাধব্যকে কহিলেন, সখে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক; আমি, কিয়ৎ ক্ষণ, প্রভুর চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন[১] করি; অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন? ও কখন কি না বলে? মৃগয়া অপকারী কি উপকারী, মহারাজই বিবেচনা করুন না কেন। দেখুন, প্রথমতঃ, স্থূলতা ও জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্ম্মণ্য হয়; ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তুগণের মনের গতি কিরূপ হয়, তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; আর, চল লক্ষ্যে[২] শরক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া আইসে; মহারাজ! যদি চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয়, ধনুর্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহারা মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে গণ্য করে, তাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন; বিবেচনা করুন, এরূপ আমোদ, এরূপ উপকার, আর কিসে আছে? মাধব্য শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, অরে নরাধম! ক্ষান্ত হ, আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না; আজ উনি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুই, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন, নরনাসিকালোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িবি।

উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা আশ্রমসমীপে আছি; এ জন্য তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অদ্য মহিষেরা, নিপানে[৩] অবগাহন করিয়া, নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক; হরিণগণ, তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া, রোমন্থ অভ্যাস করুক; বরাহেরা, অশঙ্কিত চিত্তে, পল্বলে মুস্তাভক্ষণ করুক[৪]; আর, আমার শরাসনও বিশ্রাম লাভ করুক।

[১] অনুসরণ। [২] ছুটন্ত লক্ষ্যে—moving aim। [৩] ক্ষুদ্র জলাশয়ে।
[৪] ছোট ডোবায় জলজ গাছের মূল খাউক।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন, তবে যে সমস্ত মৃগয়াসহচর অগ্রেই বনপ্রস্থান করিয়াছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন; আর, সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে সবিশেষ সতর্ক করিয়া দাও, যেন তাহারা, কোনও ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

সেনাপতি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়াসহচরদিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে, তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য, সন্নিহিত লতামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া, শীতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

এই রূপে উভয়ে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই, কারণ, দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন, কেন, তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন, তা নয় হে, আমি আশ্রমললামভূতা[1] কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, এ কি বয়স্য! তপস্বিকন্যায় অভিলাষ! রাজা কহিলেন, বয়স্য! পুরুবংশীয়েরা এরূপ দুরাচার নহে যে, পরিহার্য্য বস্তুর উপভোগে অভিলাষ করে। তুমি জান না, শকুন্তলা মেনকাগর্ভসম্ভূতা, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়া; তপস্বীর আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছে এই মাত্র, বস্তুতঃ তপস্বিকন্যা নহে।

মাধব্য, শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, যেমন, পিণ্ডখর্জ্জুর[2] ভক্ষণ করিয়া, রসনা মিষ্ট রসে অভিভূত হইলে, তিন্তিলীভক্ষণে[3] স্পৃহা হয়; সেইরূপ, স্ত্রীরত্নভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজা কহিলেন, না বয়স্য! তুমি তাকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি; যাহা তোমারও বিস্ময় জন্মাইয়াছে, সে বস্তু অবশ্যই

আশ্রমের শুভচিহ্ন স্বরূপ। [2] ডেলা খেজুর। [3] তেঁতুল খাওয়ায়।

রমণীয়। রাজা কহিলেন, বয়স্য! অধিক আর কি বলিব, তার শরীর মনে করিলে, মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা, প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবনদান করিয়াছেন; অথবা, মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রী সকল সঙ্কলিত করিয়া, মনে মনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথাস্থানে বিন্যাসপূর্ব্বক, মনে মনেই তাহার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন; হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, শরীরের সেরূপ মার্দ্দব[১] ও রূপ-লাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না। ফলতঃ, ভাই রে, সে এক অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! বুঝিলাম, শকুন্তলা যাবতীয় রূপবতীদিগের পরাভবস্থান। রাজা কহিলেন, তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুম স্বরূপ, নখাঘাতবর্জ্জিত নব পল্লব স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্ন স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল স্বরূপ; জানি না, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্ম্মল রূপের ভোগ আছে।

রাজার মুখে শকুন্তলার এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে শীঘ্র তাহাকে হস্তগত কর; দেখিও, যেন, তোমার ভাবিতে চিন্তিতে, এরূপ অসুলভরূপনিধান[২] কন্যানিধান কোনও অসভ্য তপস্বীর হস্তে পতিত না হয়। রাজা কহিলেন, শকুন্তলা নিতান্ত পরাধীনা; বিশেষতঃ, কুলপতি কণ্ব এক্ষণে আশ্রমে নাই। মাধব্য কহিলেন, ভাল বয়স্য! তোমায় এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তোমার উপর তার অনুরাগ কেমন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! তপস্বিকন্যারা স্বভাবতঃ অপ্রগল্ভস্বভাবা[৩]; তথাপি, তাহার আকারে ও ইঙ্গিতে, আমার প্রতি তদীয় অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে—যত ক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কথা কয় নাই; কিন্তু, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিন্তা হইয়া, স্থির কর্ণে শ্রবণ করিয়াছে; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, কিন্তু অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া

[১] মৃদুতা। [২] যাহা সহজে পাওয়া যায় না এমন রূপনিধি। [৩] বিনীতস্বভাবের।

থাকে নাই। আবার, প্রস্থানকালে, কতিপয় পদ মাত্র গমন করিয়া, কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল, চলিতে পারি না, এই বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; আর, কুরবকশাখায় বল্কল লাগিয়াছে, এই বলিয়া বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, সতৃষ্ণ নয়নে, বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ সকল অনুরাগের লক্ষণ বই আর কি হইতে পারে? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে তোমার মনোরথসিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। ভাগ্যক্রমে, তপোবন তোমার উপবন হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোনও কোনও তপস্বীরা আমায় চিনিতে পারিয়াছেন। বল দেখি, এখন কি ছলে, কিছু দিন তপোবনে থাকি। মাধব্য কহিলেন, কেন, অন্য ছলের প্রয়োজন কি? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়া, তপস্বীদিগকে বল, আমি রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়াছি; যাবৎ তোমরা রাজস্ব না দিবে, তাবৎ আমি তপোবনে থাকিব। রাজা কহিলেন, তপস্বীরা সামান্য প্রজার ন্যায়, রাজস্ব দেন না, তাঁহারা অন্যবিধ রাজস্ব দিয়া থাকেন; তাঁহারা যে রাজস্ব দেন, তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও প্রার্থনীয়। দেখ, সামান্য প্রজারা রাজাদিগকে যে রাজস্ব দেয়, তাহা বিনশ্বর; কিন্তু তপস্বীরা তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ[১] অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা ও মাধব্য, উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে; এমন সময়ে দ্বারবান আসিয়া কহিল, মহারাজ! তপোবন হইতে, দুই ঋষিকুমার আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, অবিলম্বে লইয়া আইস। তদনুসারে, ঋষিকুমারেরা রাজসমীপে উপনীত হইয়া, মহারাজের জয় হউক, বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা, আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, প্রণাম করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তপস্বীরা কি আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন, বলুন। ঋষিকুমারেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি এখানে আছেন জানিতে

---

১ শাস্ত্র অনুযায়ী মুনি-ঋষিগণের তপস্যার ষষ্ঠাংশ পুণ্যফল রাজা ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া পাইয়া থাকেন।

পারিয়া, তপস্বীরা মহারাজকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, মহর্ষি আশ্রমে নাই, এই নিমিত্ত, নিশাচরেরা[১] যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইতেছে; অতএব, আপনাকে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত, এই স্থানে থাকিয়া, তপোবনের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, তপস্বীদিগের এই আদেশে অনুগৃহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত[২]। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; অনন্তর, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, ঋষিকুমারদিগকে কহিলেন, আপনারা প্রস্থান করুন; আমি যথাকালে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। ঋষিকুমারেরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! না হইবেক কেন? আপনি যে বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই ব্যবহার তাহার উপযুক্তই বটে। বিপদ্‌গ্রস্তকে অভয়দান পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত।

এই বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, ঋষিকুমারেরা প্রস্থান করিলে পর, রাজা মাধব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! যদি তোমার শকুন্তলা-দর্শনে কৌতূহল থাকে, আমার সমভিব্যাহারে চল। মাধব্য কহিলেন, তোমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া, দেখিতে অতিশয় অভিলাষ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে, নিশাচরের নাম শুনিয়া, সে অভিলাষ এক বারে গিয়াছে। রাজা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিলেন, ভয় কি, আমার নিকটে থাকিবে। মাধব্য কহিলেন, তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক? এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, দ্বারপাল আসিয়া কহিল, মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়; কিন্তু, বৃদ্ধ মহিষীর[৩] বার্ত্তা লইয়া, করভক, এই মাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন, উঁহারে, অবিলম্বে, আমার নিকটে লইয়া আইস। অনন্তর, করভক

---

[১] রাক্ষস বা পিশাচ। [২] 'গলহস্ত' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'গলাধাক্কা' বা 'অর্ধচন্দ্র'। এখানে 'অনুকূল-গলহস্ত' অর্থ 'শাপে বর।' এটিকে একটি বিশিষ্ট বাক্য বলা যায়। [৩] রাজ মাতা।

রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! বৃদ্ধ দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন, আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক ব্রত আছে; সেই দিবস, মহারাজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

এ দিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, ও দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয়[১]; এই নিমিত্ত, কর্ত্তব্যনিরূপণে অসমর্থ হইয়া, রাজা নিতান্ত আকুলচিত্ত হইলেন; এবং মাধব্যকে কহিলেন, বয়স্য! বিষম সঙ্কটে পড়িলাম; কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন, কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে থাক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! এ পরিহাসের সময় নয়; সত্য সত্যই, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পরে, তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, চিন্তা করিয়া কহিলেন, সখে! মা তোমায় পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়াছেন; তুমি রাজধানী ফিরিয়া যাও, এবং জননীর পুত্রকার্য্য সম্পন্ন কর। তাঁহাকে কহিবে, তপস্বীদিগের কার্য্যে সাতিশয় ব্যস্ত আছি, এ জন্য যাইতে পারিলাম না। মাধব্য, ভাল, আমি চলিলাম; কিন্তু তুমি যেন আমায় নিশাচরভয়ে কাতর মনে করিও না; এই বলিয়া কহিলেন, এখন আমি রাজার অনুজ হইলাম; অতএব, রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন, আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে, তপোবনের উৎপীড়ন হইতে পারে; অতএব, সমুদয় অনুচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য, শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আজ আমি যথার্থ যুবরাজ হইলাম।

এই রূপে মাধব্যের রাজধানী প্রতিগমন অবধারিত হইলে, রাজার অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল, এ অতি চপলস্বভাব; হয় ত, শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রকাশ করিবেক; ইহার কি উপায় করি; অথবা এই বলিয়া বিদায় করি; এই স্থির করিয়া, মাধব্যের হস্তে ধরিয়া কহিলেন, বয়স্য! ঋষিরা, কয়েক দিনের জন্য, তপোবনে

[১] লঙ্ঘন করা যায় না।

থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত রহিলাম ; নতুবা, যথার্থই আমি শকুন্তলালাভে অভিলাষী হইয়াছি, এরূপ ভাবিও না। আমি, ইতিপূর্ব্বে, তোমার নিকট শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাস মাত্র; তুমি যেন, যথার্থ ভাবিয়া, একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি ; আমি, এক বারও, তোমার ঐ সকল কথা যথার্থ মনে করি নাই।

অনন্তর, রাজা, তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্ননিবারণার্থে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন ; এবং মাধব্যও, যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমস্ত অনুযাত্রিক[১] সঙ্গে লইয়া, রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে, সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া, তপস্বিকার্য্যের অনুরোধে, তপোবনে অবস্থিতি করিলেন ; কিন্তু, দিন যামিনী, কেবল শকুন্তলাচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল, ও সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই, তাঁহার মনের সুখ ছিল না। কোন সময়ে, কোন স্থানে গেলে, শকুন্তলাকে দেখিতে পাইবেন, নিয়ত এই অনুধ্যান[২] ও এই অনুসন্ধান। কিন্তু, পাছে তপোবনবাসীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, এই আশঙ্কায়, তিনি সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন।

এক দিন, মধ্যাহ্ন কালে, রাজা, নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে, আর আমার প্রাণরক্ষার উপায় নাই। কিন্তু, তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমায় রাজধানীপ্রতিগমনের অনুমতি করিবেন, তখন আমার কি দশা হইবেক ; কি রূপে, তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন, কোথায় গেলে, শকুন্তলাকে দেখিতে পাই।

[১] পশ্চাদ্‌গামী বা পিছনে পিছনে যাহারা যাইতেছে। [২] চিন্তা।

বোধ করি, প্রিয়া মালিনীতীরবর্ত্তী শীতল লতামণ্ডপে আতপকাল[১] অতিবাহিত করিতেছেন। সেইখানে যাই, তাঁহারে দেখিতে পাইব। এই বলিয়া তিনি, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে, সেই লতামণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলাও, রাজদর্শনদিবস অবধি দুঃসহ বিরহবেদনায় সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থার, কোনও অংশে, কোনও প্রভেদ ছিল না। সে দিবস, শকুন্তলা সাতিশয় অসুস্থ হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে মালিনী-তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে লইয়া গেলেন; তন্মধ্যবর্ত্তী শীতল শিলাতলে, নব পল্লব ও জলার্দ্র নলিনীদল[২] প্রভৃতি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলেন; এবং, তাহাতে শয়ন করাইয়া, অশেষ প্রকারে, শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, ক্রমে ক্রমে, সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্ন-প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শকুন্তলা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, লতার অন্তরাল হইতে, শকুন্তলাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আঃ! আমার নয়ন যুগল শীতল হইল, প্রিয়ারে দেখিলাম। ইহারা তিন সখীতে কি কথোপকথন করিতেছেন, লতাবিতানে ব্যবহিত[৩] হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি। এই বলিয়া, রাজা, উৎসুক মনে শ্রবণ, ও সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন, করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলার শরীরসন্তাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শীতল সলিলার্দ্র নলিনীদল লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, বায়ু সঞ্চালন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, সখি শকুন্তলে! কেমন, নলিনীদলবায়ু তোমার সুখজনক বোধ হইতেছে? শকুন্তলা কহিলেন, সখি!

[১] গ্রীষ্মকাল। [২] জলে ভেজানো পদ্মের পাপড়ি সকল। [৩] আচ্ছাদিত; আবরিত বা আড়াল।

তোমরা কি বাতাস করিতেছ? উভয়ে, শুনিয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা, দুষ্যন্তচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, এক বারে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। রাজা, শুনিয়া, ও শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইঁহাকে আজ নিরতিশয় অসুস্থশরীরা দেখিতেছি। কিন্তু, কি কারণে, ইনি এরূপ অসুস্থা হইয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ, ইঁহার ঈদৃশ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে, ইঁহারও তাহাই। অথবা, এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই; গ্রীষ্মদোষে, কামিনীগণের এরূপ অবস্থা, কোনও মতেই, সম্ভাবিত নহে।

প্রিয়ংবদা, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধিই, শকুন্তলা কেমন একপ্রকার হইয়াছে; ঐ কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে নাই? অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমারও ঐ আশঙ্কাই হয়; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! তোমার শরীরের গ্লানি উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে; অতএব, আমরা তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! কি বলিবে, বল। তখন অনসূয়া কহিলেন, তোমার মনের কথা কি, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না; কিন্তু, ইতিহাসকথায়, বিরহী জনের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, বোধ হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত অসুখ হইয়াছে, বল; প্রকৃত রূপে রোগনির্ণয় না হইলে, প্রতীকারচেষ্টা হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমার অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, এখন বলিতে পারিব না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়া ভালই বলিতেছে; কেন আপনার মনের বেদনা গোপন করিয়া রাখ? দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছ। দেখ, তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা, অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছেন; শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু, কি চমৎকার! এ অবস্থায় দেখিয়াও, আমার মনের ও নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইতেছে।

অবশেষে, শকুন্তলা, মনের ব্যথা আর গোপন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! যদি তোমাদের কাছে না বলিব, আর কার কাছেই বলিব। কিন্তু, মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া, তোমাদিগকে কেবল দুঃখভাগিনী করিব। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! এই নিমিত্তই ত আমরা এত আগ্রহ করিতেছি। তুমি কি জান না, আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

এই সময়ে, রাজা, শঙ্কিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি আপন মনের বেদনা ব্যক্ত করিবেন। প্রথমদর্শনদিবসে, প্রস্থানকালে, সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করাতে, অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল; তথাপি, এখন কি বলিবেন, এই ভয়ে অভিভূত ও কাতর হইতেছি।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি—এই মাত্র কহিয়া, লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা কি? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি, তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি, বিষণ্ণ বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্যক্রমে, তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ; অথবা, মহানদী, সাগর পরিত্যাগ করিয়া, আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক।

রাজা, শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিতে লাগিলেন, যা

শুনিবার, তা শুনিলাম ; এত দিনের পর, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না ; এখন, প্রাণবিয়োগ হইলেই, পরিত্রাণ হয়। প্রিয়ংবদা, শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! আর ইহাকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই ; আমার মতে, আর কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নয় ; ত্বরায় কোনও উপায় করা আবশ্যক। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! যাহাতে, অবিলম্বে, অথচ গোপনে, শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয়, এমন কি উপায়, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! গোপনের জন্যেই ভাবনা, অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয়। অনসূয়া কহিলেন, কি জন্যে, বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, কেন, তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ষিও, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছেন?

রাজা, শুনিয়া, স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যথার্থ ই এরূপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর অন্তরতাপে তাপিত[১] হইয়া, আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; এবং দুর্ব্বল ও কৃশও যৎপরোনাস্তি হইয়াছি।

প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! শকুন্তলার প্রণয়পত্রিকা[২] করা যাউক ; সেই পত্রিকা, আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া, নির্মাল্যচ্ছলে, রাজর্ষির হস্তে দিয়া আসিব। অনসূয়া কহিলেন, সখি! এ অতি উত্তম পরামর্শ ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হয়, তাই কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই ; মনোমত একখানি প্রণয়পত্রিকা রচনা কর। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! রচনা করিতেছি ; কিন্তু, পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন, এই ভয়ে, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

---

[১] যে তাপ পাইয়াছে এইরূপ, এখানে দুঃখিত। [২] প্রেমলিপি, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিরহিনী নায়িকা কর্তৃক এইরূপ প্রেম পত্র লিখিবার রীতি ছিল। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' দ্রষ্টব্য।

রাজা, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! তুমি, যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ, সে এই, তোমার সমাগমের নিমিত্ত, একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নেরই অন্বেষণ সকলে করিয়া থাকে।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, কহিলেন, অয়ি আত্মগুণাবমানিনি![1] কোন্ ব্যক্তি, আতপত্র[2] দ্বারা, শরৎকালীন জ্যোৎস্নার নিবারণ করিয়া থাকে? শকুন্তলা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, পত্রিকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, সখি! রচনা করিয়াছি, কিন্তু লিখনসামগ্রী কিছুই নাই, কিসে লিখি, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই পদ্মপত্রে লিখ।[3]

লিখন সমাপন করিয়া, শকুন্তলা সখীদিগকে কহিলেন, ভাল, শুন দেখি, সঙ্গত হইয়াছে কি না। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—হে নির্দয়! তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি, তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া, নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি;—এই মাত্র শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া, রাজা সহসা শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, সুন্দরি! তুমি সন্তাপিত হইতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি এক বারে দগ্ধ হইতেছি। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সহসা রাজাকে সমাগত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি হর্ষিত হইলেন, এবং, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পরম সমাদরে, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, বসিবার সংবর্দ্ধনা করিলেন। শকুন্তলাও, নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন রাজা শকুন্তলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি!

[1] যিনি নিজের গুণকে অপমান করেন—অর্থাৎ যিনি আত্মশ্লাঘা করেন না। [2] ছাতা। [3] পূর্ব্বকালে নায়িকারা অঙ্গুলিতে যে বড় নখ রাখিতেন তাহা দিয়াই পদ্মপাতায় পত্র রচনা করিয়া প্রেমিকের নিকট প্রেরণ করিতেন।

গাত্রোত্থান করিবার প্রয়োজন নাই ; তোমার দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ সংবর্দ্ধনালাভ হইয়াছে। বিশেষতঃ, তোমার শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে, কোন মতেই, শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সখীরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় সাতিশয় জড়ীভূতা হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! যাঁহার জন্যে অত উতলা হইয়াছিলে, এখন, তাঁহারে দেখিয়া, এত কাতর হইতেছ কেন? রাজা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আজ আমি তোমাদের সখীকে অতিশয় অসুস্থ দেখিতেছি। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন সুস্থ হইবেন। শকুন্তলা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

অনসূয়া কহিলেন, মহারাজ! শুনিতে পাই, রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে, কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না ; অতএব, আমরা যেন, সখীর নিমিত্ত, অবশেষে মনোদুঃখ না পাই। রাজা কহিলেন, যথার্থ বটে, রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে। কিন্তু, আমি অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, তোমাদের সখীই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হইবেন। তখন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমরা, মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া, কত কথা কহিয়াছি; ক্ষমা প্রার্থনা কর। সখীরা হাস্যমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে, সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক, অন্যের কি দায়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! যদি কিছু বলিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন ; পরোক্ষে কে কি না বলে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে, প্রিয়ংবদা, লতা-মণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন, অনসূয়ে! মৃগশাবকটি, উৎসুক হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে ; বোধ করি, আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে ; আমি উহাকে উহার মার কাছে

দিয়া আসি। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহারে ধরিতে পারিবে না; চল, আমিও যাই। এই বলিয়া, উভয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা দুজনেই আমায় ফেলিয়া চলিলে, আমি এখানে একাকিনী রহিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! একাকিনী কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকটে রাখিয়া গেলাম। এই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, উভয়ে লতামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীরা চলিয়া গেল, এই বলিয়া, উৎকণ্ঠিতার ন্যায় হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! সখীদের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? আমি তোমার সখীস্থানে রহিয়াছি; যখন যে আদেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবেক। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মাননীয় ব্যক্তি, এ দুঃখিনীকে অকারণে অপরাধিনী করেন কেন? এই বলিয়া, শয্যা হইতে উঠিয়া, শকুন্তলা গমনোন্মুখী হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! এ কি কর; একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল অতি উত্তাপের সময়; এ অবস্থায়, এ সময়ে, লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া, কোনও মতেই, উচিত নয়। এই বলিয়া, হস্তে ধরিয়া, রাজা নিবারণ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সখীদের নিকটে যাই; তুমি জান না, আমি আপনার বশ নই। রাজা, লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া, শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি না, দৈবের তিরস্কার করিতেছি। রাজা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার করিতেছ কেন? দৈবের অপরাধ কি? শকুন্তলা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার শত বার করিব; সে আমায়, পরের অধীন করিয়া, পরের গুণে মোহিত করে কেন?

এই বলিয়া, শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা পুনরায় শকুন্তলার হস্তে ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ!

কি কর, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, সুন্দরি! তুমি গুরু জনের ভয় করিতেছ কেন? ভগবান্ কণ্ব কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। শত শত রাজর্ষিকন্যারা, গুরুজনের অগোচরে, গান্ধর্ব্ব বিধানে,[১] অনুরূপ পাত্রের হস্তগতা হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের গুরুজনেরাও, পরিশেষে, সবিশেষ অবগত হইয়া, সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা, মহারাজ! এই সম্ভাষণমাত্রপরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবেন না; এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া, চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! তুমি, আমার হাত ছাড়াইয়া, সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া, আর আমার পা উঠিতেছে না। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ, অন্তরালে থাকিয়া, ইহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া, লতাবিতানে আবৃতশরীরা[২] হইয়া, শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ অন্তরে, অবস্থান করিলেন।

রাজা, একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানি না; কিন্তু তুমি, নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া, আমায় এক বারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি বড় কঠিন। পরে, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন, আর প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি ফল? এই বলিয়া, তিনি তথা হইতে চলিয়া যান, এমন সময়ে, শকুন্তলার মৃণালবলয় ভূতলে পতিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন; এবং, পরম সমাদরে, বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক, কৃতার্থম্মন্য চিত্তে, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয়, অচেতন হইয়াও, এই দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিলেক, কিন্তু তুমি তাহা করিলে না। শকুন্তলা, ইহা শুনিয়া, আর বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই বা যাই;

[১] আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির অন্যতম। অপরের অনুমতি না লইয়া বর-কন্যার স্বমতে বিবাহ। [২] শরীর ঢাকিয়া, এখানে লুকাইয়া থাকিয়া।

অথবা, মৃণালবলয়ের ছল করিয়া যাই; এই বলিয়া, পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শনমাত্র, হর্ষসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিলেন, এই যে আমার জীবিতেশ্বরী আসিয়াছেন! বুঝিলাম, দেবতারা, আমার পরিতাপ শুনিয়া, সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনরায় প্রিয়ারে দেখিতে পাইলাম। চাতক, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, জল-প্রার্থনা করিল; অমনি, নব জলধর হইতে, শীতল সলিলধারা তাহার মুখে পতিত হইল।

শকুন্তলা রাজার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্দ্ধ পথে স্মরণ হওয়াতে, আমি মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি, আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন, যদি তুমি আমায় যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তবেই তোমার মৃণালবলয় তোমায় দি, নতুবা দিব না। শকুন্তলা অগত্যা সম্মত হইলেন। রাজা কহিলেন, আইস, এই শিলাতলে বসিয়া, পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা, শকুন্তলার হস্ত লইয়া, মৃণালবলয় পরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! সত্বর হও, সত্বর হও। রাজা, আর্য্যপুত্রসম্ভাষণ শ্রবণে, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই আর্য্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে; বুঝি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। অনন্তর, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! মৃণালবলয়ের সন্ধি সম্যক্ সংশ্লিষ্ট হইতেছে না[১]; যদি তোমার মত হয়, প্রকারান্তরে সংযোজন করিয়া পরাই। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোমার যা অভিরুচি।

রাজা, নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন, সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন, দেখিব কি, আমার নয়নে কর্ণোৎপলরেণু[২] পতিত হইয়াছে, এ জন্য, দেখিতে পাইতেছি না।

[১] পদ্মের কাঁটা দিয়া নির্মিত বলয় গাঁট আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। [২] প্রাচীন কালে মহিলারা ফুল কর্ণভূষণ করিয়া পরিতেন।

রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার অনুমতি হয়, ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন, তাহা হইলে অতিশয় উপকৃত হই বটে; কিন্তু তোমায় অত দূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! অবিশ্বাসের বিষয় কি; নূতন ভৃত্য কি কখনও প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে? শকুন্তলা কহিলেন, ঐ অতিভক্তিই অবিশ্বাসের কারণ। অনন্তর রাজা, শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া, তাঁহার মুখকমল উত্তোলিত করিলেন। শকুন্তলা, শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা, সুন্দরি! শঙ্কা কি; এই বলিয়া, শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শকুন্তলা কহিলেন, তোমায় আর পরিশ্রম করিতে হইবেক না; আমার নয়ন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে; আর কোনও অসুখ নাই। মহারাজ! আমি অতিশয় লজ্জিত হইতেছি; তুমি আমার এত উপকার করিলে; আমি তোমার কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার চাই? আমি যে তোমার সুরভি মুখকমলের আঘ্রাণ পাইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট পুরস্কার হইয়াছে; মধুকর কমলের আঘ্রাণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে।

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, চক্রবাকবধূ! রজনী উপস্থিত; এই সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও; এই শব্দ শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শকুন্তলা, সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতৃষ্বসা[১] আর্য্যা গৌতমী, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন আছি, জানিতে আসিতেছেন; এই নিমিত্তই, অনসূয়া

[১]পিতার ভগিনী, পিসি।

ও প্রিয়ংবদা, চক্রবাক ও চক্রবাকীর[১] ছলে, আমাদিগকে সাবধান করিতেছে; তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত ও অন্তর্হিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম, যেন পুনরায় দেখা হয়; এই বলিয়া, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া, শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া, কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্ব্ব শরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন, এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এই মাত্র, মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই। অপরাহ্ণ হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। পরিশেষে, গান্ধর্ব্ব বিধানে, শকুন্তলার পাণিগ্রহণসমাধান[২] পূর্ব্বক, ধর্ম্মারণ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া, রাজা নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

[১] চকাচকি। এ ক্ষেত্রে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে বুঝাইতেছে। নাম উল্লেখ করিলে পাছে গৌতমী বুঝিতে পারেন এইজন্য সখী দুইটি সঙ্কেত নাম ব্যবহার করিয়া শকুন্তলাকে সহায়তা করিতেছে। [২] বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা দুষ্মন্ত প্রস্থান করিলে পর, এক দিন, অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন, সখি! শকুন্তলা, গান্ধর্ব্ব বিধানে, আপন অনুরূপ পতি পাইয়াছে বটে; কিন্তু, আমার এই ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা, নগরে গিয়া, অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সমাগমে, শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! সে আশঙ্কা করিও না; তেমন আকৃতি কখনও গুণশূন্য হয় না। কিন্তু, আমার আর ভাবনা হইতেছে, না জানি, পিতা আসিয়া, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কি বলেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমার বোধ হইতেছে, তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কর্ম্ম হয় নাই। কেন না, তিনি, প্রথম অবধি, এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন, গুণবান্ পাত্রে কন্যা প্রদান করিব; যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল, তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য্য হইলেন। সুতরাং, ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষের বিষয় কি। উভয়ে, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে, পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলা, অতিথিপরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়া, একাকিনী কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা আছেন; দৈবযোগে, দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিলেন, আমি অতিথি। শকুন্তলা, রাজার চিন্তায় নিতান্ত মগ্ন হইয়া, এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দুর্ব্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা অবজ্ঞাদর্শনে রোষবশ হইয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অবমাননা করিলি। তুই, যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আমায় অবজ্ঞা করিলি—আমি অভিশাপ দিতেছি—স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোরে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা, শুনিতে পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া, কহিতে লাগিলেন,

হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ ঘটিল। শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা, কোনও পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, প্রিয়ংবদা কহিতে লাগিলেন, সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা, ইঁহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখ, শাপ দিয়া, রোষভরে, সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে, আর কি হইবেক বল? শীঘ্র গিয়া, পায় ধরিয়া, ফিরাইয়া আন; আমিও, এই অবকাশে, কুটীরে গিয়া, পাদ্য অর্ঘ্য[১] প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনসূয়া কুটিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়া কুটীরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সখি! জানই ত, দুর্ব্বাসা স্বভাবতঃ অতিকুটিলহৃদয়; তিনি কি কাহারও অনুনয় শুনেন; তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম, নিতান্তই ফিরিবেন না, তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম, ভগবন্! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে? কৃপা করিয়া, তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। তখন তিনি কহিলেন, আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক; এই বলিয়া, চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন, ভাল, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজর্ষি, প্রস্থানকালে, শকুন্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছেন। অতএব, শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপমোচনের উপায় রহিয়াছে। রাজা যদিই বিস্মৃত হন, ঐ অঙ্গুরীয় দেখাইলেই তাঁহার স্মরণ হইবেক। উভয়ে, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণে, তাঁহারা কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শকুন্তলা, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, স্পন্দহীনা, মুদ্রিতনয়না,

[১] পা-ধুইবার জল, পূজার সামগ্রী অর্থে ফলমূল ইত্যাদি

চিত্রার্পিতার[১] ন্যায়, উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা, পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া, এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। অনসূয়া কহিলেন, সখি! এ বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনে থাকুক, কোনও মতে কর্ণান্তর[২] করা হইবেক না; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ সলিলে নবমালিকার সেচন করে?

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি, অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; এমন সময়ে, এই দৈববাণী হইল—মহর্ষে! রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে, তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন। মহর্ষি, এই রূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অগোচরে, ও সম্মতি ব্যতিরেকে, সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে, শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর তিনি, প্রফুল্ল বদনে, শকুন্তলার নিকটে গিয়া, সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং স্থির করিয়াছি, অবিলম্বে, দুই শিষ্য ও গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমায় পতিসন্নিধানে পাঠাইয়া দিব। অনন্তর, তদীয় আদেশ ক্রমে, শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলাসমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, যথাসম্ভব, বেশ ভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি, শোকাকুল হইয়া, মনে মনে কহিতে

[১] আঁকা ছবি। [২] অপর কান।

লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া, বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ, আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য[১] উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা, এমন অবস্থায়, কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর, তিনি, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া, তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত[২] তরুগণ! যিনি, তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত, আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে, আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে, তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্র-মুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

[১] কাতরতা বা অধীরতা। [২] নিকটস্থ।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে[১] সম্ভাষণ না করিয়া, যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা, আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল? এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল? কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে, তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত, তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক[২] আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদীতৈল[৩] দিয়া ব্রণশোষণ[৪] করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতি রোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর, পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

---

[১] এক শ্রেণীর বৃক্ষ। [২] ধান্য বিশেষ। [৩] রেড়ির তেল। [৪] ক্ষতের ঘা শুষ্ক।

এই বলিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের[১] ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব, কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর, শকুন্তলা, বন্ধুবর্গের অগোচরে, স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য[২] প্রদর্শন করিলেও, রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা, এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া, বলিলেন, দেখ,

১ বৃক্ষ বিশেষ। ২ কঠোরতা।

গৌতমীই বা কি বলেন ? গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক ? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা ! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

এই রূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে ! আমরা আর অধিক দূর যাইব না ; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবেক ? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে ! ইহাদের বিবাহ হয় নাই ; অতএব, সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না ; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদগদ স্বরে কহিলেন, তাত ! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণ-ধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে ! এত কাতর হইতেছ কেন ? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহ-জনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত ! আবার, কত দিনে, এই তপোবনে আসিব ? কণ্ব কহিলেন, বৎসে ! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতিসমভিব্যাহারে, পুনরায়, এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া, গৌতমী কহিলেন, বাছা ! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায় ; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও ; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি ! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই

রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া, অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল? তোমাদের কথা শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমীপ্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্মন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া, ও প্রিয়ংবদা, একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে, শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া, মহর্ষি আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে, মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ, অদ্য আমি, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ, হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক দিন, রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্য্যসমাধানান্তে,[১] একান্তে আসীন হইয়া, প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে কালযাপন করিতেছেন; এমন সময়ে, হংসপদিকা নামে এক পরিচারিকা, সঙ্গীতশালায়, অতি

---

[১] রাজকার্য্য শেষ করিয়া।

মধুর স্বরে, এই ভাবের গান করিতে লাগিল, অহে মধুকর! অভিনব মধুর লোভে, সহকারমঞ্জরীতে[১] তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন, কমলমধু পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহারে একেবারে বিস্মৃত হইলে কেন?

হংসপদিকার গীতি শ্রবণগোচর হইবামাত্র, রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন; কিন্তু, কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন, তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, আমার চিত্ত এমন আকুল হইতেছে? প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে, মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা, মনুষ্য, সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে, জন্মান্তরীণ[২] স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

রাজা মনে মনে এই বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে, কঞ্চুকী আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, নিবেদন করিল; মহারাজ! ধর্ম্মারণ্যবাসী তপস্বীরা, মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া, আসিয়াছেন; কি আজ্ঞা হয়। রাজা, তপস্বিশব্দ শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে, বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া, অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইসেন; আমিও, ইত্যবকাশে, তপস্বিদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া, রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ প্রদান পূর্ব্বক, কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া, রাজা অগ্নিগৃহে[৩] গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন? কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কি কোনও দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই নির্ণয় করিতে না

[১] আমের মুকুল। [২] জন্মের ওপার হইতে পূর্ব্বজন্মের। [৩] অগ্নিশালা, যজ্ঞশালা।

পারিয়া, আমার মন অতিশয় আকুল হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মারণ্যবাসী ঋষিরা, মহারাজের অধিকারে, নির্ব্বিঘ্নে, ও নিরাকুল চিত্তে, তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন; এই হেতু, প্রীত হইয়া, মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত, তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহাদের উপস্থিতির প্রতীক্ষায়, দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন, ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে, সাতিশয় প্রীত হইতে হয়, এবং সবিশেষ প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ, ফলিত হইলে, ফলভরে অবনত হইয়া থাকে; বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নম্রভাব অবলম্বন করে; সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে, তাঁহারা অনুদ্ধতস্বভাব হয়েন।

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি, সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া, গৌতমীকে কহিলেন, পিসি! আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন? গৌতমী কহিলেন, বৎসে! শঙ্কিতা হইও না; পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন। যাহা হউক, শকুন্তলা, তদবধি, মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও নিরতিশয় আকুলহৃদয়া হইলেন।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? কি নিমিত্তই বা, ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন? পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমিও, দেখিয়া অবধি, নানা বিতর্ক করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে

পারিতেছি না। যা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী, কখনও, কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। রাজা কহিলেন, ও কথা ছাড়িয়া দাও; পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা পরস্ত্রীর কথা লইয়া আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নহে। এ দিকে, শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন? আর্য্যপুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া, আশ্বাসিত হও, ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা, ক্রমে ক্রমে, সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা, প্রণাম করিয়া, ঋষিদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি শাসনকর্ত্তা থাকিতে, ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্নসম্ভাবনা কোথায়? সূর্য্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য[১] হইয়া কহিলেন, অদ্য আমার রাজশব্দ সার্থক হইল। পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কণ্বের কুশল? ঋষিরা কহিলেন, হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্ব্বাংশেই কুশলী।

এই রূপে, প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আমাদের গুরুদেবের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন,—মহর্ষি কহিয়াছেন, আপনি, আমার অনুপস্থিতকালে, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; আমি, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি; আপনি, সর্ব্বাংশে, আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র; এক্ষণে আপনকার সহধর্ম্মিণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, গ্রহণ করুন। গৌতমীও কহিলেন, মহারাজ! আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলাও গুরুজনের অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে

---

[১] যে নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া জানে

জিজ্ঞাসা কর নাই; তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে, যাহা করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে।

শকুন্তলা, মনে মনে শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্য্যপুত্র এখন কি বলেন। রাজা, দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে, শকুন্তলাপরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং, শুনিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা একে বারে ম্রিয়মাণা হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও, আপনি এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, পরিণীতা নারী যদিও সর্ব্বাংশে সাধুশীলা হয়, সে নিয়ত পিতৃকুলবাসিনী[১] হইলে, লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে; এই নিমিত্ত, সে পতির অপ্রিয়া হইলেও, পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন, কই, আমি ত ইঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া, বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব, রাজার অস্বীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্ত্ততার আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ। জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন; অন্যে অন্যায় করিলে, আপনি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এক্ষণে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মদ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজা কহিলেন, আপনি আমায় এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়, তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন, আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি, কোনও ক্রমে, এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

---

১ বাপের বাড়ী থাকিলে।

এই রূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ[১] ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অবনতমুখী দেখিয়া, গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি; তাহা হইলে, মহারাজ তোমায় চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর সংশয়ারূঢ়[২] হইয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজা কহিলেন, মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম; কিন্তু ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, কোনও ক্রমেই, স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং, কি প্রকারে, ইঁহারে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি; বিশেষতঃ, ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্ব্বনাশ! এক বারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া, অশেষ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিব বলিয়া, যত আশা করিয়াছিলাম, সমুদয় এককালে নির্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! বিবেচনা করুন, মহর্ষি কেমন মহানুভাবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি, তাঁহার অগোচরে তাঁহার অনুমতি-নিরপেক্ষ হইয়া, তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি, তাহাতে রোষ প্রকাশ বা অসন্তোষ প্রদর্শন না করিয়া, বিলক্ষণ সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কন্যারে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে, প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাদৃশ সদাশয় মহানুভাবের অবমাননা করা মহারাজের, কোনও মতেই, কর্ত্তব্য নহে। আপনি, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করুন।

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন; তিনি কহিলেন,

[১] মানিতে অনিচ্ছুক। [২] সন্দেহ পরায়ণ।

অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি, এক কথায়, সকল বিষয়ের শেষ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ বলিতেছেন; এক্ষণে, তোমার যাহা বলিবার থাকে, বল, এবং যাহাতে উঁহার প্রতীতি[১] জন্মে, তাহা কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদু স্বরে কহিলেন, যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব; কিন্তু, আত্মশোধনের নিমিত্ত, কিছু বলা আবশ্যক। এই বলিয়া, আর্য্যপুত্র! এইমাত্র সম্ভাষণ করিয়া, শকুন্তলা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর, কহিলেন, যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আর আর্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করা উচিত হইতেছে না। এইরূপ বলিয়া, তিনি কহিলেন, পৌরব! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে, তপোবনে, তাদৃশী অমায়িকতা দেখাইয়া, ও ধর্ম্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে, এরূপ দুর্বাক্য বলিয়া, প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।

রাজা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে, যেমন বর্ষাকালের নদী তীরতরুকে পতিত ও আপন প্রবাহকে পঙ্কিল করে, তেমনি তুমিও আমায় পতিত ও আপন কুলকেও কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি তুমি, যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া, পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোনও অভিজ্ঞান[২] দর্শাইয়া, তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন, এ উত্তম কল্প[৩]; কই, কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে, ব্যস্ত হইয়া, অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন, অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন তিনি, বিষণ্ণা ও

[১] বিশ্বাস। [২] চিহ্ন। [৩] অভিপ্রায়

ম্লানবদনা হইয়া, গৌতমীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গৌতমী কহিলেন, বোধ হয়, আলগা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, স্ত্রীজাতি অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি[১], এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে, ইহা তাহার এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

শকুন্তলা, রাজার এইরূপ ভাব দর্শনে, ম্রিয়মাণা হইয়া কহিলেন, আমি, দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ, অঙ্গুরীয়প্রদর্শন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলাম বটে; কিন্তু এমন কোনও কথা বলিতেছি যে, তাহা শুনিলে, পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবশ্যই তোমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইবেক। রাজা কহিলেন, এক্ষণে শুনা আবশ্যক; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন, মনে করিয়া দেখ, এক দিন, তুমি ও আমি, দুজনে নবমালিকামণ্ডপে বসিয়া ছিলাম। তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙা ছিল। ইহা কহিয়া, শকুন্তলা রাজার মুখ পানে তাকাইলে, রাজা কহিলেন, ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন, সেই সময়ে, আমার কৃতপুত্র, দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইল। তুমি উহারে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া, সে তোমার নিকটে আসিল না; পরে, আমি হস্তে করিলে, আমার নিকটে আসিয়া, অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে, সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমরা দুজনেই জঙ্গলা, এ জন্য ও তোমার নিকটে গেল। রাজা, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনা-বাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ। গৌতমী, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিত, প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা জানে না।

---

১ উপস্থিত বুদ্ধি।

রাজা কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধতাপসি! প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিখিতে হয় না; মানুষের ত কথাই নাই, পশু পক্ষীদিগেরও, বিনা শিক্ষায়, প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকিলারা, কেমন কৌশল করিয়া, স্বীয় সন্তানদিগকে, অন্য পক্ষী দ্বারা, প্রতিপালিত করিয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন; অনার্য্য! তুমি আপনি যেমন, সকলকেই সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন, তাপসকন্যে! দুষ্মন্ত গোপনে কোনও কর্ম্ম করে না; যখন যাহা করিয়াছে, সমস্তই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন, তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব, এই বিশ্বাস করিয়া, যখন আমি মধুমুখ হলাহল-হৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এরূপ ঘটিবেক, ইহা বিচিত্র নহে। এই বলিয়া, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কর্ম্ম করিলে, পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, করা কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা, পরিশেষে, শত্রুতাতে পর্য্যবসিত হয়। শার্ঙ্গরবের তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা কহিলেন, কেন আপনি, স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, আমার উপর, অকারণে, এরূপ দোষারূপ করিতেছেন? শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে[১] চাতুরী শিখে নাই, তাহার কথা অপ্রমাণ; আর, যাহারা পরপ্রতারণা বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে, তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবেক? তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম, প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা

---

[১] জন্ম হইতে।

ও ব্যবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া, আমার কি লাভ হইবেক ? শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, নিপাত ! রাজা কহিলেন, পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

এই রূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া, শারদ্বত কহিলেন, শার্ঙ্গরব ! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলে প্রয়োজন নাই ; আমরা গুরুনিয়োগের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছি ; এক্ষণে ফিরিয়া যাই, চল। এই বলিয়া তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর ; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, ও গৌতমী, তিন জনে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে কহিলেন, ইনি ত আমার এই করিলেন ; তোমরাও আমায় ফেলিয়া চলিলে ; আমার কি গতি হইবেক ; এই বলিয়া, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন, বৎস শার্ঙ্গরব ! শকুন্তলা, কাঁদিতে কাঁদিতে, আমাদের সঙ্গে আসিতেছে ; দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন, এখানে থাকিয়া আর কি করিবেক, বল ? আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া, সরোষ নয়নে মুখ ফিরাইয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, আঃ পাপীয়সি ! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন, দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থ সেরূপ হও, তাহা হইলে, তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে ; তাত কণ্ব আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর, যদি তুমি আপনাকে পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে, পতিগৃহে থাকিয়া, দাসীবৃত্তি করাও, তোমার পক্ষে, শ্রেয়ঃ। অতএব, এইখানেই থাক, আমরা চলিলাম।

তপস্বীদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, রাজা শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি উঁহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? পুরুবংশীয়েরা, প্রাণান্তেও, পরবনিতাপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না; চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনি, পরকীয় মহিলার আশঙ্কা করিয়া, অধর্ম্মভয়ে শকুন্তলা-পরিগ্রহে পরাঙ্‌মুখ হইতেছেন: কিন্তু ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, আপনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া, রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বলুন। আমিই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীলোক মিথ্যা বলিতেছেন; এমন সন্দেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী[১] হই।

পুরোহিত শুনিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বিবেচনা করিয়া, কহিলেন, ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন, কি, আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন, ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, একথা বলি কেন? সিদ্ধ পুরুষেরা কহিয়াছেন, আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত[২] হইবেন। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হন, ইহারে গ্রহণ করিবেন; নতুবা ইহার পিতৃসমীপগমন স্থিরই রহিল। রাজা কহিলেন, যাহা আপনাদের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন, তবে আমি ইহাকে, প্রসবকাল পর্য্যন্ত, আমার আলয়ে লইয়া রাখি। পরে, তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন, বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা, পৃথিবি! বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করি; আর আমি এ প্রাণ রাখিব না; এই বলিয়া, রোদন করিতে করিতে, পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা, নিতান্ত উন্মনা হইয়া, শকুন্তলার বিষয় অনন্যমনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কি

---

[১] পরস্ত্রীস্পর্শজনিত পাপ। [২] চক্রবর্ত্তিলক্ষণযুক্ত।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল! কি হইল! বলিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে, আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, অপ্সরাতীর্থের নিকট, আপন অদৃষ্টের দোষকীর্ত্তন করিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি এক জ্যোতিঃপদার্থ, স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন, মহাশয়! যাহা প্রত্যাখ্যাত[১] হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই; আপনি আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজাও, শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া, নিতান্ত আকুলহৃদয় হইয়াছিলেন; এ জন্য, অবিলম্বে সভাভঙ্গ করিয়া, শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নদীতে স্নান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয়, শকুন্তলার অঞ্চলকোণ হইতে, সলিলে পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবামাত্র, এক অতিবৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য, কতিপয় দিবসের পর, এক ধীবরের জালে পতিত হইল। ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে, ঐ মৎস্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে করিতে, তদীয় উদর মধ্যে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইল। ঐ অঙ্গুরীয় লইয়া, পরম উল্লাসিত মনে, সে এক মণিকারের আপণে[২] বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার, সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর স্থির করিয়া, নগরপালের নিকট সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে

[১] পরিত্যক্ত। [২] দোকানে।

পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল, এবং জিজ্ঞাসিল, অরে বেটা চোর! তুই এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল্? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস্, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি, সুব্রাহ্মণ দেখিয়া, তোরে দান করিয়াছেন?

এই বলিয়া, নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে, চৌকীদার ধীবরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমায় মার কেন; আমি, কেমন করিয়া, এই আঙটি পাইলাম, বলিতেছি। এই বলিয়া, সে কহিল, আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করি। নগরপাল, শুনিয়া, কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর্ বেটা, আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্। ধীবর কহিল, আজ সকালে, আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া, উহার পেটের ভিতরে, এই আঙটি দেখিতে পাইলাম। তার পর, এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আমায় ধরিলেন, আমি আর কিছুই জানি না; আমায় মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল, শুনিয়া, আঘ্রাণ লইয়া দেখিল, অঙ্গুরীয়ে আমিষগন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে, সন্দিহান হইয়া, চৌকীদারকে কহিল, তুই এ বেটাকে, এইখানে, সাবধানে, বসাইয়া রাখ্। আমি, রাজবাটীতে গিয়া, এই বৃত্তান্ত রাজার গোচর করি। রাজা, শুনিয়া, যেরূপ অনুমতি করেন। এই বলিয়া, নগরপাল, অঙ্গুরীয় লইয়া, রাজভবনে গমন করিল; এবং, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, প্রত্যাগত হইয়া, চৌকীদারকে কহিল, অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নয়! অঙ্গুরীয়প্রাপ্তি বিষয়ে ও যাহা কহিয়াছে, বোধ হইতেছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আর, রাজা উহারে অঙ্গুরীয়ের তুল্যমূল্য এই মহামূল্য পুরস্কার

দিয়াছেন। এই বলিয়া, পুরস্কার দিয়া, নগরপাল ধীবরকে বিদায় দিল, এবং, চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র, শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত রাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি, নিরতিশয় কাতর হইয়া, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং, শকুন্তলার পুনর্দর্শনবিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া, সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহার, বিহার, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা প্রভৃতি এক বারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, তিনি সর্ব্বদাই ম্লান ও বিষণ্ণ বদনে কালযাপন করিতে লাগিলেন; লোক মাত্রের সহিত বাক্যালাপ এক কালে রহিত হইল; কোনও ব্যক্তির কোনও কারণে, রাজসন্নিধানে গতিবিধি এক বারে প্রতিষিদ্ধ[১] হইয়া গেল। কেবল প্রিয় বয়স্য মাধব্য সর্ব্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। মাধব্য সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত; নয়নযুগল হইতে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে, মাধব্য তাঁহাকে প্রমোদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বয়স্য! যদি তুমি তপোবনে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তবে, তিনি উপস্থিত হইলে, প্রত্যাখ্যান করিলে কেন? রাজা, শুনিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া, আমি শকুন্তলাবৃত্তান্ত এক বারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস, প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমার কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া, কতই দুর্বাক্য কহিয়াছি, কতই অবমাননা করিয়াছি। এই

১ অবরুদ্ধ

বলিতে বলিতে, নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর, মাধব্যকে কহিলেন, ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম; তোমায় ত সমুদায় বলিয়াছিলাম; তুমি কেন, কথাপ্রসঙ্গেও, কোনও দিন, শকুন্তলার কথা উত্থাপিত কর নাই? তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে?

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! আমার দোষ নাই: সমুদয় কহিয়া পরিশেষে তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে, শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই পরিহাসমাত্র,[১] বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত নির্বোধ; তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত, কখনও সে বিষয়ের উল্লেখ করি নাই। বিশেষতঃ, প্রত্যাখ্যানদিবসে, আমি তোমার নিকটে ছিলাম না; থাকিলে, যাহা শুনিয়াছিলাম, আবশ্যক বোধ হইলে, বলিতে পারিতাম। রাজা, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, বয়স্য! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া, তিনি সাতিশয় শোকাভিভূত হইলেন। তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, সৎপুরুষেরা শোকের ও মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত জনেরাই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়ই বায়ুভরে বিচলিত হয়, তবে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? তুমি গম্ভীরস্বভাব, ধৈর্য্য অবলম্বন ও শোকাবেগ সংবরণ কর।

প্রিয় বয়স্যের প্রবোধবাণী[২] শ্রবণ করিয়া, রাজা কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু, মন আমার, কোনও ক্রমে প্রবোধ মানিতেছে না; কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া, প্রস্থানকালে, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত

[১] ছলনা। [২] সান্ত্বনাবাণী।

আমার বক্ষঃস্থলে, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমি, তৎকালে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে করিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ যাবে না।

মাধব্য, রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া, আশ্বাসপ্রদানার্থে কহিলেন, বয়স্য! অত কাতর হইও না; কিছু দিন পরে, পুনরায়, শকুন্তলার সহিত নিঃসন্দেহ, তোমার সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, সে আশা করি না। এ দেহধারণে, আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। ফল কথা এই, এ জন্মের মত, আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। নতুবা, তৎকালে আমার তেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল কেন? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! কোনও বিষয়েই নিতান্ত হতাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় তোমার হস্তে আসিবেক, কাহার মনে ছিল।

ইহা শুনিয়া, অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অঙ্গুরীয়! তুমিও আমার মত হতভাগ্য; নতুবা, প্রিয়ার কমনীয় কোমল অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া, কি নিমিত্ত, সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি, কি উপলক্ষে, তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে? রাজা কহিলেন, রাজধানীপ্রত্যাগমন সময়ে, প্রিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, আমার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! কত দিনে আমায় নিকটে লইয়া যাইবে? তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম, প্রিয়ে! তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটি অক্ষর গণিবে; গণনাও সমাপ্ত হইবেক, আমার লোক আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেক। প্রিয়ার নিকট, সরল হৃদয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু, মোহান্ধ হইয়া, একেবারেই বিস্মৃত হই।

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! এ অঙ্গুরীয়, কেমন করিয়া, রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, শচীতীর্থে স্নান করিবার সময়, প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে, সলিলে পতিত হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন, হাঁ, সম্ভব বটে, সলিলে পতিত হইলে, রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি এই অঙ্গুরীয়ের যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন, অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া, জলে মগ্ন হইয়া, তোর কি লাভ হইল, বল্? অথবা, তোরে তিরস্কার করা অন্যায়; কারণ, অচেতন ব্যক্তি কখনও গুণগ্রহণ করিতে পারে না; নতুবা, আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়ারে পরিত্যাগ করিলাম? এই বলিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমায় অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি; অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা কর।

রাজা, শোকাকুল হইয়া, এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে, চতুরিকানাম্নী পরিচারিকা, এক চিত্রফলক আনিয়া দিল। রাজা, চিত্ত-বিনোদনার্থে, ঐ চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য, দেখিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, বয়স্য! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছ! দেখিয়া, কোনও মতে, চিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ লাবণ্যের মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে[১] কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে! রাজা কহিলেন, সখে! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত, আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহারে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে না। তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশমাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত হইয়াছে। এই বলিয়া, পরিচারিকাকে

---

[১] মুখপদ্মে।

কহিলেন, চতুরিকে! বর্ত্তিকা[১] ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস; অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া, চতুরিকাকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যকে কহিলেন, সখে! আমি স্বাদুশীতলনির্মলজলপূর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, মৃগতৃষ্ণিকায় পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি; প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন, তপোবন ও মালিনীনদী লিখিব; যে রূপে, হরিণগণকে, তপোবনে, সচ্ছন্দ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনীনদীতে কেলি করিতে দেখিয়াছিলাম, সে সমুদয়ও চিত্রিত করিব; আর, প্রথম দর্শনের দিবসে, প্রিয়ার কর্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম, তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া রাজহস্তে একখানি পত্র দিল। রাজা, পাঠ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া, এত বিষণ্ণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক[২] সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া, তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত, অমাত্য আমায় তদীয় সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়! নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং বহু যত্নে, বহু কষ্টে, বহু কালে, উপার্জ্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া, মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি

---

[১] তুলি। [২] জলপথে বাণিজ্যকারী পোতবণিক্।

অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে, তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমায় মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিতের প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আমি যখন, নিতান্ত বিচেতন হইয়া, প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার পুত্রমুখনিরীক্ষণের আশা নাই।

এই রূপে, কিয়ৎ ক্ষণ বিলাপ করিয়া, রাজা অপুত্রতানিবন্ধন শোকের সংবরণ পূর্ব্বক, প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি, ধনমিত্রের অনেক ভার্য্যা আছে; তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা থাকিতে পারেন; অমাত্যকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতিহারী কহিল, মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর[১] কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা। শুনিয়াছি, শ্রেষ্ঠিকন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া, প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত, পুনরায়, শকুন্তলাসংক্রান্ত কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, ইন্দ্রসারথি মাতলি, দেবরথ লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, দেখিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, মাতলিকে, স্বাগত জিজ্ঞাসা পুরঃসর,[২] আসনপরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসনপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কালনেমির সন্তান দুর্জ্জয় নামে দুর্দ্দান্ত দানবগণ দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে; কতিপয় দিবসের নিমিত্ত, দেবলোকে গিয়া, আপনাকে দুর্জ্জয় দানবদলের দমন করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, দেবরাজের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; পরে মাধব্যকে কহিলেন, বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি, কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে

---

[১]বণিক। [২] পূর্ব্বক।

ব্যাপৃত হইলাম ; আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত, তিনি একাকী সমস্ত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করুন।

এই বলিয়া, সসজ্জ হইয়া, রাজা, ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক, দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা, দানবজয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য্যসমাধানের পর, মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমনকালে, মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার করেন, আমি, আপনাকে সেই সৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া, মনে মনে অতিশয় সঙ্কুচিত হই। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া, সঙ্কুচিত হন ; দেবরাজও, স্বকৃত সৎকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

ইহা শুনিয়া, রাজা কহিলেন, দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিবেন না ; বিদায় দিবার সময়, দেবরাজ যে সৎকার করিয়া থাকেন, তাহা মাদৃশ[১] জনের মনোরথেরও অগোচর। দেখুন, সমবেত সর্ব্ব দেব সমক্ষে, অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা[২] অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি, সময়ে সময়ে দানবজয় করিয়া, দেবরাজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিতে গেলে, আজ কাল, মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপদ্রব রহিয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি

[১] আমার মত। [২] স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষের ফুলের মালা।

যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি, সে দেবরাজেরই মহিমা; নিযুক্তেরা, প্রভুর প্রভাবেই, মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া উঠে। যদি সূর্য্যদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন, তাহা হইলে, অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন? তখন মাতলি সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিনয় সদ্‌গুণের শোভাসম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বর্ত্তিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত হইয়া, কিয়ৎ দূর আগমন করিয়া, রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! ঐ যে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বত স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্ব্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও হেমকূট পর্ব্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি; তপস্বীদিগের তপস্যাসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান; ভগবান্ কশ্যপ ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ[১] করিয়া যাইব; এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণ, চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। তুমি রথ স্থির কর, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অধিকদূরবর্ত্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, এক ঋষিকুমারকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন? ঋষিকুমার কহিলেন, এক্ষণে তিনি নিজপত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি

[১] দেবীমূর্ত্তি ইত্যাদিকে দক্ষিণে রাখিয়া পরিভ্রমণ।

কহিলেন, মহারাজ! আপনি, এই অশোক বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করিতেছি। এই বলিয়া, মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন তিনি, নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে হস্ত! আমি যখন, নিতান্ত বিচেতন[১] হইয়া, প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই; তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ। রাজা, মনে মনে, এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, বৎস! এত উদ্ধত হও কেন, এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা, শ্রবণ করিয়া, মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের স্থান নহে; এখানে, যাবতীয় জীব জন্তু, স্থানমাহাত্ম্যে, হিংসা, দ্বেষ, মদ[২], মাৎসর্য্য[৩] প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর সৌহার্দ্দে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না; এমন স্থানে কে ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিতেছে! যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।

এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, রাজা, শব্দানুসারে, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু, সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া, অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে; সিংহশিশু, অবিকৃত চিত্তে, সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর, তিনি, কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহরসপরিপূর্ণ চিত্তে, কহিতে লাগিলেন, আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে, মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া, আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন?

---

[১] অচেতন। [২] ষড়রিপুর এক, গর্ব, প্রমত্ততা, সম্মোহ। [৩] পরশ্রীকাতরতা।

অথবা, আমি পুত্রহীন বলিয়া, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরূপ স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর যৎপরোনাস্তি[১] উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা, আপন সন্তানের ন্যায়, স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর, যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমায় জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, সিংহশাবকের উপর অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা, ভয় প্রদর্শন দ্বারা, তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন, বৎস! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় একটি ভাল খেলানা দিব।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু, সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না গিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহ নয়নে, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সেই বালক, কই কি খেলানা দিবে দাও বলিয়া, হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদের সঙ্গে কোনও খেলানা ছিল না; সুতরাং, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল, তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন, সখি! ও কথায় ভুলাইবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটির ময়ূর আছে, ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী, মৃন্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ, কুটীরে গমন করিলেন।

---

[১] যার পর নাই।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া, রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে, মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া, যখন ইহার মুখচুম্বন করে; হাস্য করিলে, যখন ইহার মুখমধ্যে, অর্দ্ধবিনির্গত কুন্দসন্নিভ[১] দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে; তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া, এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সর্ব্ব শরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধ-বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব; এবং, অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত, আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক কহিল, এখনও ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া, সিংহশিশুকে, অতিশয় বলপ্রকাশ পূর্ব্বক, আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তদীয় হস্তগ্রহ[২] হইতে সিংহ-শিশুকে, কোনও মতে, মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এমন সময়ে, এখানে কোনও ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া, পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবা মাত্র, তিনি, রাজাকে দেখিতে পাইয়া, কহিলেন, মহাশয়! আপনি, অনুগ্রহ করিয়া, নিরীহ সিংহশিশুকে এই দুর্দ্দান্ত বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া, সেই বালককে,

[১] কুন্দফুলতুল্য। [২] হস্তবন্ধন

ঋষিপুত্রবোধে, তদনুরূপ সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ। তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন, বালকের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, ঋষিকুমার নয়; কিন্তু, এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগম-সম্ভাবনা নাই, এ জন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া, রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পরকীয় পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি, ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া, কি অনুপম সুখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না।

বালক, নিতান্ত দুর্দ্দান্ত হইয়াও, রাজার নিকট একান্ত শান্তস্বভাব হইল. ইহা দেখিয়া, এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, ঐ বালক ঋষিকুমার নহে, ইহা অবগত হইয়া, তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন, মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা, প্রথমতঃ, সাংসারিক সুখভোগে সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে, সস্ত্রীক হইয়া, অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।

পরে, রাজা, তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; অতএব, এই বালক, কি সংযোগে, এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন, ইহার জননী, অপ্সরাসম্বন্ধে, এখানে আসিয়া, এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ, এই দুই কথা শুনিয়া,

আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া, তিনি তাপসীকে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, আপনি জানেন, এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ ব্যক্তির পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্ত্তন করিবেক। রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ কথা আমারেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই, এক কালে, সকল সন্দেহ দূর হইবেক; অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। আমি যখন, মোহান্ধ হইয়া, স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে, কেবল, সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক; অতএব, ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, অপরা তাপসী, কুটীর হইতে, মৃণ্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য[১] দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলাশব্দ শ্রবণ করিয়া, বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। ইহা বলিয়া, রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই বালক, জন্মাবধি, জননী ভিন্ন, আপনার কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত, নিতান্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলাবণ্যশব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া, উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

সমুদায় শ্রবণগোচর করিয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীরও নাম শকুন্তলা? কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর, সকল

[১] শকুন্ত অর্থ পক্ষী, পক্ষী লাবণ্য।

কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই সকল কথা শুনিয়া, আমার আশাই বা না জন্মিবেক কেন? অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায়[১] ভ্রান্ত হইয়াছি; এজন্য, নামসাদৃশ্য শ্রবণে, মনে মনে, বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি; এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা, অনেক ক্ষণ অবধি, পুত্রকে দেখেন নাই, এ নিমিত্ত, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে, সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, এক দৃষ্টিতে, তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগলে, প্রবলবেগে, জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও, অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে, তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবা মাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদগদ বচনে কহিলেন, বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাজা, মনের আবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে, আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই, অবমাননা পূর্ব্বক, তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই, সমস্ত বৃত্তান্ত, আমার স্মৃতিপথে উপনীত হইয়াছিল; তদবধি, আমি কি অসুখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনরায় তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি, প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

[১] মরীচিকা।

রাজা এই বলিয়া, উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা, অস্তব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া, কহিলেন, আর্য্যপুত্র! উঠ, উঠ; তোমার দোষ কি; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর, দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে, শকুন্তলার নয়নযুগল হইতে, প্রবলবেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা, গাত্রোত্থান করিয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যানকালে, তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম; পরে, সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে, তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া, সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল; প্রবল প্রবাহে, নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর, দুঃখাবেগের সংবরণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল না। কি রূপে আমি পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে উপনীত হইলাম, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমায় যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে, উহা আমার হস্তে পড়িলে, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলীস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই; ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, মহারাজ! এত দিনের পর, আপনি যে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত

আহ্লাদিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও, শুনিয়া, সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে, আশ্রমে গিয়া, ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! চল, আজ উভয়ে, এক সমভিব্যাহারে, ভগবানের চরণদর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরু জনের নিকটে যাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! শুভ সময়ে, এক সমভিব্যাহারে, গুরু জনের নিকটে যাওয়া দোষাবহ নহে; চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া, রাজা, শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে, কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ভগবান্, অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন: তখন, সস্ত্রীক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে[১] সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ, বৎস! চিরজীবী হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে, অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ; তোমায় অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী হও। এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া, কশ্যপ উভয়কে উপবেশন করিতে বলিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে, নিবেদন করিলেন, ভগবন্! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া। মৃগয়াপ্রসঙ্গে তদীয় তপোবনে উপস্থিত হইয়া, আমি, গান্ধর্ব্ব বিধানে, ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম; পরে, ইনি যৎকালে রাজধানীতে নীত হন, তখন, আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল যে, ইহাকে চিনিতে পারিলাম না। চিনিতে না পারিয়া, প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট, যার পর নাই, অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া,

[১] বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, হাত জোড় করিয়া।

আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আর, যাহাতে ভগবান্ কণ্ব আমার উপর অক্রোধ হন, আপনাকে তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ[১] ঘটিয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা, উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত, আমি সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি; শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যাননিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! রাজা, তপোবন হইতে, স্বীয় রাজধানী প্রতিগমন করিলে পর, একদিন তুমি, পতিচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, কুটীরে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে, দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি, এক কালে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ছিলে, সুতরাং, তাঁহার সৎকার বা সংবর্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি, কুপিত হইয়া, তোমায় এই শাপ দিয়া, চলিয়া যান, তুই, যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনও তোরে স্মরণ করিবেক না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা, শুনিতে পাইয়া, তাঁহার চরণ ধরিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন। তখন তিনি কহিলেন, এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, বৎস! দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবেই, তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল; তাহাতেই তুমি ইহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয়বাক্যে, কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞানদর্শনকে শাপমোচনের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত, অঙ্গুরীয়দর্শন মাত্র, শকুন্তলাবৃত্তান্ত পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, রাজা কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ

[১] স্মৃতিবিচ্যুতি, স্মৃতিনাশ।

হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল; নতুবা, আর্য্যপুত্র, এমন সরলহৃদয় হইয়া, কেন আমায় অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? দুর্ব্বাসার শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যেই, তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্ন পূর্ব্বক আর্য্যপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজ ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা, যাবজ্জীবন, আমার অন্তঃকরণে, আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, ক্ষোভ থাকিত। পরে, কশ্যপ, রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং, সকল ভুবনের ভর্ত্তা[১] হইয়া, উত্তর কালে, ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার[২] করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে, কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ-প্রদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস! বহু দিবস হইল, রাজধানী হইতে আসিয়াছ; অতএব, আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে, প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক, সপুত্র, রথে আরোহণ করিলেন, এবং, নিজ রাজধানী প্রত্যাগমণ পূর্ব্বক, পরম সুখে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

[১] অধিপতি, ভরণকর্ত্তা, রাজা। [২] মন্ত্রাদির দ্বারা শোধন।

সীতার বনবাস

[১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল প্রকাশিত]

[১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মুদ্রিত পঞ্চবিংশ সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

সীতার বনবাস প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈদৃশ করুণরসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে; সুতরাং, সহৃদয় লোকে পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি, সীতার বনবাস, কিঞ্চিৎ অংশেও, পাঠকবর্গের প্রীতিপদ হয়, তাহা হইলেই, আমি চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ।
সংবৎ ১৯১৮ [১৯১৭]।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন, ও অপত্যনির্ব্বিশেষে[১] প্রজাপালন, করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে, স্বল্প সময়েই, সমস্ত কোশলরাজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ, তদীয় অধিকারকালে, প্রজালোকের সর্ব্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চার ঘটিয়াছিল, ভূমণ্ডলে, কোনও কালে, কোনও রাজার শাসনসময়ে, সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি, প্রতিদিন, যথাকালে, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, অবহিত চিত্তে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন ; অবশিষ্ট সময়, ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ার সহবাসসুখে[২] অতিবাহিত হইত।

কালক্রমে, জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে, রামের ও রামজননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না ; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল ; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার দেখিব, এই মনের উল্লাসে, স্ব স্ব আবাসে, অশেষবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা রামচন্দ্র, পরিবারবর্গের সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইলেন। এই সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এ জন্য তিনি, এবং তদনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ, নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে পারিলেন না ; কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে, জামাতৃযজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারাও, পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় যাইতে, কোনও মতে, সম্মত

---

১ আপন সন্তানের ন্যায়। ২ একত্র অবস্থানজনিত আনন্দে।

ছিলেন না ; কেবল, জামাতৃকৃত নিমন্ত্রণের উল্লঙ্ঘন[১] সর্ব্বথা অবিধেয়, এই বিবেচনায়, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, যজ্ঞদর্শনে গমন করেন।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে, রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি, কৌশল্যাপ্রভৃতির নিমন্ত্রণ-গমনের অব্যবহিত পরেই, মিথিলায় প্রতিগমন করিলেন। প্রথমতঃ শ্বশ্রূজনবিরহ[২], তৎপরেই পিতৃবিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুলা হইলেন। পূর্ণগর্ভ অবস্থায় শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে, অনিষ্টাপাতের[৩] বিলক্ষণ সম্ভাবনা ; এ জন্য রামচন্দ্র, সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সীতার সান্ত্বনার নিমিত্ত, সতত তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এক দিবস, রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, প্রতীহারী আসিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া, অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন। রাম ও জানকী, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আন। প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র, দীর্ঘায়ুরস্তু[৪] বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, আমার গুরুজন ও আর্য্যা শান্তা[৫] সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে মনে করেন, না একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন?

অষ্টাবক্র, সকলের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক, জানকীকে বলিলেন, দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে

১ অতিক্রম। ২ শাশুড়িগণের অদর্শনজনিত দুঃখ। ৩ অনিষ্ট+আপাত, অনিষ্টের আপতন বা বিপদ ঘটন। ৪ দীর্ঘায়ু হউন। ৫ দশরথের কন্যা।

বলিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা[১] দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন; সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা; তুমি সর্ব্বপ্রধান রাজকুলের বধূ হইয়াছ; তোমার বিষয়ে আর কোনও প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না; অহোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও। সীতা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইলেন। রাম যার পর নাই হর্ষিত হইয়া বলিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব যখন এরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোরথ সম্পন্ন হইবেক। অনন্তর, অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী, বৃদ্ধ মহিষীগণ ও কল্যাণী শান্তা ভূয়োভূয়ঃ[২] বলিয়াছেন, সীতা দেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হয়। রাম বলিলেন, আপনি তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, ইনি যখন যে অভিলাষ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইতেছে; সে বিষয়ে আমার, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, আলস্য বা ঔদাস্য নাই।

অনন্তর অষ্টাবক্র বলিলেন, দেবি জানকি! ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, বৎসে! তুমি পূর্ণগর্ভা, এজন্য তোমায় আনিতে পারি নাই, তন্নিমিত্ত আমি যেন তোমার বিরাগভাজন না হই; আর, রাম ও লক্ষ্মণকে তোমার চিত্তবিনোদনার্থে রাখিতে হইয়াছে; আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলেই, আমরা সকলে, অযোধ্যায় গিয়া, তোমার ক্রোড়দেশ একেবারে নব কুমারে সুশোভিত দেখিব। রাম শুনিয়া, স্মিতমুখ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া, অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আমার প্রতি কোনও আদেশ করিয়াছেন? অষ্টাবক্র বলিলেন, মহারাজ! বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, বৎস! জামাতৃযজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে, কিছু দিন, এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তুমি বালক, অল্পদিন মাত্র, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; প্রজারঞ্জন-কার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে; প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই

---

[১] পৃথিবী। [২] বারংবার।

রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন। রাম বলিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য। আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া বলিবেন, যদি প্রজালোকের সর্ব্বাঙ্গীন অনুরঞ্জনের জন্য, আমায় স্নেহ, দয়া বা সুখভোগে বিসর্জ্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি যেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন; আমি প্রজারঞ্জনকার্য্যে, ক্ষণকালের জন্যেও, অলস ও অনবহিত[১] নহি। সীতা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, এরূপ না হইলেই বা, আর্য্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর[২] হইবেন কেন?

অনন্তর, রামচন্দ্র সন্নিহিত পরিচারকের প্রতি অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র, সমুচিত সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া, বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া বলিলেন, আর্য্য! আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে বলিয়াছিলাম; সে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন। রাম বলিলেন, বৎস! দেবী দুর্মনায়মানা[৩] হইলে, কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাণ্ড পর্য্যন্ত।

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার সমক্ষে আর ও-কথা মুখে আনিও না; ও-কথা শুনিলে, অথবা মনে হইলে, আমি সাতিশয় কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও আবার

[১] অমনোযোগী। [২] ধুরন্ধর: মূল অর্থ: ভারবহনে দক্ষ।

[৩] দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

অন্য পাবন[১] দ্বারা পূত করিতে হইয়াছিল। হায়, লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত! সীতা বলিলেন, নাথ! সে সকল কথা মনে করিয়া, আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালে সদ্বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছিলেন; সেরূপ না করিলে, চিরনির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্কস্পর্শ হইত, এবং আমারও অপবাদ বিমোচন হইত না। সীতার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! আর ও-কথায় কাজ নাই; এস, আলেখ্য দেখি।

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা, কিয়ৎ ক্ষণ, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক[২] জৃম্ভক[৩] অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র পাইয়াছিলেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি, সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাড়কানিধনকালে আমায় তৎসমুদয় দিয়াছিলেন। তদবধি, উহারা আমার অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে তাহাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবেক।

লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! এ দিকে মিথিলাবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন। সীতা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে! আবার, এ দিকে বিবাহকালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ। চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান

[১] শুদ্ধকারী বস্তু। [২] মন্ত্রপূত। [৩] সম্মোহন অস্ত্র।

রহিয়াছি! শুনিয়া, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ বলিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পিত করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণ বলিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি; কিন্তু তিনি, লজ্জাবশতঃ, উর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে উর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ, কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসনের[১] ভঙ্গবার্ত্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন[২], আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রুদ্ধ করিয়া, দণ্ডায়মান আছেন; আর, এ দিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য, তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত, শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এ জন্য বলিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় আছে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে, একবাক্য হইয়া, আপনার এত প্রশংসা করিবেক কেন?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা, অভিনব বধূদিগকে পাইয়া, কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন; সতত, তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতই বা মমতাপ্রদর্শন করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময়

[১] মহাদেবের ধনু; এই ধনু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন।

[২] পরশুরাম।

ও উৎসবপূর্ণ হইয়াছিল। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের, কি উৎসবের, দিনই গিয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নামশ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া, কোনও উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে,[১] যে তাপসতরুর তলে, পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, নাথ! এ দিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা, বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, অরণ্যে বাস করেন; কিন্তু আর্য্যকে, বাল্যকালেই, কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর, তিনি রামকে বলিলেন, আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকূটে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, যাহার কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা বলিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা মনে হয়? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া, আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া, নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ-সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই

[১] নিষাদরাজ গুহকের নগর; বর্ত্তমান চুনার নগর

জনস্থান[1] মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে[2], নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গবিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া, আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া, ম্লান বদনে বলিলেন, হা নাথ! এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুরাচার মারীচ, হিরণ্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া, যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্য্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে, মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্য্য, মানবসমাগমশূন্য জনস্থান ভূভাগে, বিকলচিত্ত হইয়া, যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন,

[1] দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান। ইহারই পশ্চিমে দণ্ডকারণ্য অবস্থিত। [2] গতিশীল মেঘ সমূহের মিলনে।

তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্যে, আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে, রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া, আপনি এত শোকাভিভূত হইতেছেন কেন? রাম বলিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে, আমি, কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে, বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছ; এখন অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন; এবং, বিষয়ান্তরের সংঘটন দ্বারা, রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আর্য্য! এদিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ দৃষ্টিগোচর করুন; এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এ দিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী[১] শ্রমণা; এই এ দিকে পম্পা সরোবর। রাম, পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি, তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল, মন্দমারুত[২] দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরের নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া, উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস

[১] যোগসিদ্ধ ব্যাধপত্নী। [২] ধীর ভাবে প্রবাহিত বাতাস।

প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ, মনের আনন্দে, নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে, আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে, মুহূর্ত্ত মাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক এক বার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।

সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রু নয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধরমণ্ডলের সহযোগে, শিখরদেশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া, পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না; শুনিয়া, আমার শোকসাগর, অনিবার্য্য বেগে, উথলিয়া উঠিতেছে; জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব[১] অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে, সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে; এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

এই বলিয়া বিদায় লইয়া, লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে বলিলেন, নাথ! চিত্র দেখিতে দেখিতে, আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম বলিলেন,

---

১ নূতন রূপ।

প্রিয়ে! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্ব্বার মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া, তপোবনে বিহার ও নির্ম্মল ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিব। সীতার অভিলাষ শ্রবণগোচর করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! এই মাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক; অতএব, গমনের উপযোগী আয়োজন কর; কল্য প্রভাতেই, ইনি অভিলষিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন। সীতা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, নাথ! আপনিও সঙ্গে যাইবেন। রাম বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবেক; আমি কি, তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া, এক মুহূর্ত্তও সুস্থ হৃদয়ে থাকিতে পারিব? তৎপরে সীতা, সস্মিত মুখে, লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া, গমনে উপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, অসঙ্কুচিত ভাবে, অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নিদ্রাকর্ষণের[১] উপক্রম হইল। তখন রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যদি ক্লান্তিবোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পিত করিয়া, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। সীতা, কোমল বাহুবল্লী দ্বারা, রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে, তিনি অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখের অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার বাহুলতার স্পর্শে,

১ নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা।

আমার সর্ব্ব শরীরে যেন অমৃতধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ, উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সীতা, রামমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান[১] বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, হাস্যমুখে বলিলেন, নাথ! আপনি চিরানুকূল ও স্থিরপ্রসাদ[২]। যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা, স্ত্রীলোকের পক্ষে, আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে। প্রার্থনা এই, যেন চির দিন এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে।

সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার কথা শুনিলে, শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃকরণের সজীবতা সম্পাদিত হয়। সীতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্রিয়ংবদ বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভাগিনীর যে এত সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই বলিয়া, সীতা শয়নের নিমিত্ত উৎসুক হইলে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এখানে অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি নাই; অতএব, যে অনন্যসাধারণ রামবাহু, বিবাহসময় অবধি, কি গৃহে, কি বনে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, উপাধানস্থানীয়[৩] হইয়া আসিয়াছে, আজও সেই তোমার উপাধানকার্য্য সম্পন্ন করুক। এই বলিয়া, রাম বাহু প্রসারিত করিলেন; সীতা, তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইলেন।

রাম, স্নেহভরে কিয়ৎ ক্ষণ সীতার মুখনিরীক্ষণ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! যখনই প্রিয়ার বদনসুধাকরে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। ফলতঃ,

---

[১] অমৃততুল্য। [২] স্থির সহায়। [৩] বালিশের মত কোমল স্নিগ্ধ আশ্রয়স্থল।

ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী[১]; ইহার স্পর্শ চন্দনরসে অভিষেকস্বরূপ; বাহুলতা, কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে, শীতল মসৃণ মৌক্তিক হারের কার্য্য করে। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার সকলই অলৌকিক প্রীতিপদ। রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা, নিদ্রাবেশে বলিয়া উঠিলেন, হা নাথ! কোথায় রহিলে।

সীতার স্বপ্নভাষিত শ্রবণগোচর করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! চিত্রদর্শনে, প্রিয়ার অন্তঃকরণে যে অতীত বিরহ-ভাবনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই, স্বপ্নে অস্তিত্ব পরিগ্রহ করিয়া, যাতনা প্রদান করিতেছে। এই বলিয়া, সীতার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন[২] করিতে করিতে, রাম, প্রেমভরে প্রফুল্লকলেবর হইয়া, বলিতে লাগিলেন, আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণয়সুখের অধিকারী হওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ; যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।

রামের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, প্রতিহারী, সম্মুখে আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! দুর্ম্মুখ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়। দুর্ম্মুখ অন্তঃপুরচারী অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাম, নূতন রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত, তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে, প্রতি দিন, প্রচ্ছন্ন ভাবে, ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিত, এবং যে দিন যাহা জানিতে পারিত, রামের গোচর করিয়া যাইত। এক্ষণে উহাকে সমাগত শুনিয়া, রাম প্রতিহারীকে বলিলেন, ত্বরায় উহারে আমার

১ কাজলের মত। ২ হাত বুলান।

নিকটে আসিতে বল। দুর্ম্মুখ আসিয়া, প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাম, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে দুর্ম্মুখ! আজ কি জানিতে পারিয়াছ, বল? দুর্ম্মুখ বলিল, মহারাজ! কি পৌরগণ[১], কি জনপদগণ[২], সকলেই বলে, আমরা রাম রাজ্যে পরম সুখে আছি।

এই কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, তুমি প্রতি দিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক; যদি কেহ কোনও দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্নবান্ হই; আমি, স্তুতিবাদ-শ্রবণবাসনায় তোমায় অনুসন্ধান করিতে পাঠাই নাই। দুর্ম্মুখ, অন্য অন্য দিন, স্তুতিবাদ মাত্র শুনিয়া আসিত; সুতরাং, যাহা শুনিত, তাহাই অকপটে রামের নিকটে জানাইত। সে দিবস, সীতাসংক্রান্ত দোষকীর্ত্তন শুনিয়া, অপ্রিয়সংবাদপ্রদান অনুচিত, এই বিবেচনায়, গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে, রাম দোষকীর্ত্তন-কথার উল্লেখ করিবামাত্র, সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; পরে, কথঞ্চিৎ বুদ্ধি স্থির করিয়া, শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, না মহারাজ! আমি কোনও দোষকীর্ত্তন শুনিতে পাই নাই। সে এইরূপে অপলাপ করিল বটে; কিন্তু, তাহার আকারপ্রকার দর্শনে, রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি, সাতিশয় চলচিত্ত হইয়া, আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, তুমি অবশ্যই দোষকীর্ত্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন? কি শুনিয়াছ বল, বিলম্ব করিও না; না বলিলে, আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব, এবং, এ জন্মে, আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।

রামের নির্ব্বন্ধাতিশয়[৩] দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, দুর্ম্মুখ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম!

---

[১] নগরবাসী। [২] গ্রামবাসী। [৩] অতিশয় আগ্রহ।

কি রূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব? আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ কার্যের ভারগ্রহণ করিব কেন? কিন্তু যখন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, ভারগ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রভুর নিকটে, অকপটে, প্রকৃত কথাই বলা উচিত। এই স্থির করিয়া, সে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিল, মহারাজ! যদি আমায় সকল কথা যথার্থ বলিতে হয়, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহান্তরে চলুন; আমি সে সকল কথা, প্রাণান্তেও, এখানে বলিতে পারিব না। রাম, শুনিবার নিমিত্ত, এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, সীতার জাগরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; আস্তে আস্তে, আপন হস্ত হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন, এবং, দুর্ম্মুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বর সন্নিহিত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া, রাম, সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক, দুর্ম্মুখকে বলিলেন, বিলম্ব করিও না, কি শুনিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল; তোমার আকার প্রকার দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। সে বলিল, মহারাজ! যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট বলিতে হইবেক, এই মনে করিয়া, আমার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া ওরূপ কার্য্যের ভার লইয়াছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবেক। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, নিবেদন করিতেছি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ! প্রায় সকলেই, একবাক্য হইয়া, অশেষ প্রকারে, সুখ্যাতি করিয়া বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে বাস করিতেছি; কোনও রাজা, কোশল দেশে, শাসনের এরূপ সুপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু, কেহ কেহ, রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া, কুৎসা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, আমাদের রাজার চিত্ত বড় নির্ব্বিকার; একাকিনী সীতা এত কাল রাবণগৃহে রহিলেন; তিনি, তাহাতে কোনও দ্বৈধ[১] বা

[১] দ্বিধার ভাব।

দোষবোধ না করিয়া, অনায়াসে তাঁহারে গৃহে আনিলেন। অতঃপর, আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রে দোষ ঘটিলে, তাহাদের শাসন করা সহজ হইবেক না; শাসন করিতে গেলে, তাহারা, রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া, আমাদিগকে নিরুত্তর করিবেক। অথবা, রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা; তিনি যে ধর্ম্ম অনুসারে চলিবেন, আমরা প্রজা, আমাদিগকেও, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, চলিতে হইবেক। মহারাজ! যাহা শুনিয়াছিলাম, অবিকল নিবেদন করিলাম, আমার অপরাধমার্জ্জনা করিবেন। হা বিধাতঃ! এত দিনের পর, তুমি আমার দুর্ম্মুখনাম অন্বর্থ করিয়া দিলে। এই বলিয়া, বিদায় লইয়া, রোদন করিতে করিতে, দুর্ম্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্ম্মুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া, রাম, হা হতোঽস্মি বলিয়া, ছিন্ন তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন, এবং গলদশ্রু[১] লোচনে, আকুল বচনে, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা, আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্যে এখনও জীবিত রহিয়াছি? আমি নিতান্ত হতভাগ্য; নতুবা, কি নিমিত্তে, উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বিসর্জ্জন দিয়া, আমায় বনবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল? কি নিমিত্তেই দুর্ব্বৃত্ত দশানন, পঞ্চবটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক, প্রাণপ্রিয়া জানকীরে লইয়া গিয়া, নির্ম্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব্ব অপবাদে দূষিত করিয়াছিল? কি নিমিত্তেই বা, সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে অপসারিত হইয়াও, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া, সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবেক? সর্ব্বথা, আমার জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ দুঃখভোগের নিমিত্তেই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া

---

[১] অশ্রুপূর্ণ।

উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বলিয়া, এই অপবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করি; অথবা, এ জন্মের মত নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জ্জন দিয়া, কুলের কলঙ্কবিমোচন করি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার মত উভয় সঙ্কটে পড়ে না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম, কিয়ৎ ক্ষণ, অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, অথবা এ বিষয়ে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনার প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, সর্ব্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম; সুতরাং, জানকীরেই বিসর্জ্জন দিতে হইল। হা হত বিধে! তোমার মনে এই ছিল। এই বলিয়া, রাম মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে চেতনাসঞ্চার হইলে, রাম নিতান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, যদি আর আমার চেতনা না হইত, আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর হইত; নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জ্জন দিয়া, দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না। এই মাত্র, অষ্টাবক্রের সমক্ষে, প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি লোকরঞ্জনের অনুরোধে, জানকীরেও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও করিব। এরূপ ঘটিবেক বলিয়াই কি, আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে[১]! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে, যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও, তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি, চন্দনতরুবোধে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা

[১] রামময় প্রাণ, জীবিত অর্থে জীবন বা প্রাণ

সহস্র গুণে অধম ; নতুবা, বিনা অপরাধে, তোমায় বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ পাই। আর বাঁচিয়া ফল কি ; আমার জীবিতপ্রয়োজন[১] পর্য্যবসিত[২] হইয়াছে ; জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে।

এইরূপ বলিতে বলিতে, একান্ত আকুলহৃদয় ও কম্পমানকলেবর হইয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; অনন্তর, দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে, হায়! কি হইল বলিয়া, নিরতিশয় কাতর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি[৩]! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়নন্দন[৪]! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতে পারিতেছ না ; এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা, আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহণে অধিকারী নহি ; আমার ন্যায় মহাপাতকী[৫] নামগ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীরে, নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে, পরিণামে তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ, রামের হৃদয় বজ্রলেপময়,[৬] নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা, জানিয়া

[১] জীবনের প্রয়োজন বা বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন। [২] শেষ।
[৩] ঋষি বশিষ্ঠের পত্নী। [৪] অঞ্জনার পুত্র হনুমান। [৫] মহাপাপীয়সী।
[৬] পারদ ইত্যাদি জলে দিবার সময় যে দুর্ভেদ্য আবরণ বা আধার ব্যবহার করা হয় তাহাকে 'বজ্রলেপ' বলে। এখানে, কঠিন হৃদয়।

শুনিয়াই, আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছেন; তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিব কেন?

এই বলিয়া, গলদশ্রু নয়নে, বিশ্রামভবনে প্রতিগমন পূর্ব্বক, রাম, নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং, অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক, সাতিশয় করুণ স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম, এ জন্মের মত, বিদায় লইতেছে। এই বলিয়া, দুর্ব্বিষহ শোকদহনে দগ্ধহৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং, অনুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণের নিমিত্তে, মন্ত্রভবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাম, মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, তিন জনকে, সত্বর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিবাবসানসময়ে আর্য্য জনকতনয়াসহবাসে কালযাপন করেন, ঈদৃশ সময়ে, মন্ত্রভবনে গমন করিয়া, অকস্মাৎ আমাদিগের আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ভরতপ্রভৃতি সাতিশয় সন্দিহান ও আকুলহৃদয় হইলেন, এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে, সত্বরগমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাম, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, একাকী উপবিষ্ট আছেন, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। অগ্রজের তাদৃশী দশা দৃষ্টিগোচর করিয়া, অনুজেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং, কি কারণে তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া,

সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্টসঙ্ঘটনের আশঙ্কা করিয়া, তিন জনের মধ্যে, কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে, তাঁহারাও তিন জনে, ঘোরতর বিপৎপাত স্থির করিয়া, এবং রামের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া[১], সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক, অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা, আসনে উপবেশন করিয়া, কাতর ভাবে, রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে, প্রবলবেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারাও, যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য! আপনকার এই অবস্থা দেখিয়া, আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোনও অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি, কখনও, অল্প কারণে আকুলিত হয় না; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে, হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে, আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান, ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

লক্ষ্মণ, এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে, কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, রামচন্দ্র অতি দীর্ঘনিঃশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দুর্ব্বহ শোকভরে

---

[১] মুছিয়া বা পরিষ্কার করিয়া।

অভিভূত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস ভরত! বৎস লক্ষ্মণ! বৎস শত্রুঘ্ন! তোমরা আমার জীবন, তোমরা আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমাদের নিমিত্তই আমি দুর্ব্বহ রাজ্যভারের দুঃসহ বহনক্লেশ সহ্য করিতেছি। হিতসাধনে বা অহিতনিবারণে তোমরাই আমার প্রধান সহায়। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি, এবং সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের অভিপ্রায়ে, তোমাদিগকে অসময়ে সমবেত করিয়াছি। আপতিত[১] অনিষ্টের নিবারণোপায় একমাত্র আছে। আমি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বোধ করিয়াছি। তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর; সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত তোমাদের গোচর করিয়া, সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা, উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।

এই বলিয়া, রাম বিরত হইলেন, এবং পুনর্ব্বার, প্রবল বেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনুজেরা তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আর্য্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই অতি বিষম অনর্থপাত ঘটিয়াছে; না জানি কি সর্ব্বনাশের কথাই বলিবেন। কিন্তু, অনুভবশক্তি দ্বারা কিছুরই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারা, একান্ত আকুল হৃদয়ে, তদীয় বদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন।

রাম, কিয়ৎ ক্ষণ, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন, ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা, এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোক-বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে

---

১ যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিত।

দুষ্পরিহর[১] কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে, আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্ব্বৃত্ত দশানন, আমাদের অনুপস্থিতিকালে, বলপূর্ব্বক, সীতারে আপন আলয়ে লইয়া যায়। সীতা একাকিনী, সে দুর্ব্বৃত্তের[২] আলয়ে, দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে আমরা, সুগ্রীবের সহায়তায়, দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া, সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতারে লইয়া গৃহে রাখিয়াছি; ইহাতে পৌরগণ ও জানপদবর্গ অসন্তোষপ্রদর্শন ও কলঙ্ককীর্ত্তন করিতেছে। এ জন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে আর গৃহে রাখিব না। সর্ব্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন রাজার পরম ধর্ম্ম। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায়, বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে, তোমরা, প্রশস্ত মনে,[৩] অনুমোদন কর; তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।

অগ্রজের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া, অনুজেরা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন; এবং, ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, অধোমুখে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরিশেষে, লক্ষ্মণ, অতি কাতর স্বরে, বিনীত ভাবে, নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আপনি যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা কখনও তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করি নাই; এক্ষণেও, আমরা আপনকার আজ্ঞাপ্রতিরোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু, আপনকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, আমাদের প্রাণপ্রয়াণের[৪] উপক্রম হইয়াছে। আমরা যে, আপনকার নিকটে আসিয়া, এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিব, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে, আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি প্রদান করেন, নিবেদন করি।

[১] যাহা পরিহার বা ত্যাগ করা দুরূহ। [২] নীচ ব্যক্তির।
[৩] উদার মনে। [৪] প্রাণ যাওয়ার।

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাম বলিলেন, বৎস! যা বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা জানকী একাকিনী রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; এবং রাবণও অতি দুর্ব্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু, দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধানের পর, আর্য্যা আপনকার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি, লোকাপবাদভয়ে, প্রথমতঃ, গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; পরে, অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা, তিনি শুদ্ধচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহারে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্ব্বজনসমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ, এবং যাবতীয় দেবগণ, দেবর্ষিগণ, ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই, সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক, আর্য্যা একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহারে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলক লোকাপবাদ শুনিয়া, ভবাদৃশ মহানুভবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে; এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। আর্য্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যত দূর জানি, আপনকার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় নাই; এবং, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্য্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে, লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবেক; এবং ধর্ম্মতঃ বিবেচনা

করিতে গেলে, আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যাবধারণ[১] করুন। আমরা আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ; যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই, অসন্দিহান চিত্তে, শিরোধার্য্য করিব।

এই বলিয়া, লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। রাম, কিয়ৎ ক্ষণ, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, বৎস! সীতা যে একান্ত শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; সামান্য লোকে যে, কোনও বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়া, যাহা শুনে, বা যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহারই আন্দোলন করে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, এ বিষয়ে প্রজাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই; আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা[২] দোষেই, এই বিষম সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। যদি আমরা, অযোধ্যায় আসিয়া, সমবেত পৌরগণ ও জানপদবর্গ সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তৎসংক্রান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বীয় শুদ্ধচারিতার অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বটে; কিন্তু, সেই পরীক্ষার যথার্থতা বিষয়ে প্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বোধ করি, অনেকে পরীক্ষাব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ অবগত নহে। সুতরাং, সীতার চরিত্র বিষয়ের তাহাদের সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, রাবণের চরিত্র, ও বহু কাল একাকিনী সীতার তদীয় আলয়ে অবস্থান, এই দুই বিষয়ে বিবেচনা করিলে, সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব, আমি প্রজাদিগকে কোনও অংশে দোষ দিতে পারি না। আমারই অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, এই উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। আমি যদি রাজ্যের ভারগ্রহণ না করিতাম; এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, প্রজারঞ্জন-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে, অমূলক লোকাপবাদে

[১] কার্যনিধারণ। [২] হঠকারিতা।

অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া, নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি? দেখ, প্রজালোকে, সীতা অসতী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই সিদ্ধান্ত অপসারিত করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং, সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমারে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবেক। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি, প্রজারঞ্জনের অনুরোধে, প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি; তোমরা আমার প্রাণাধিক; যদি ঐ অনুরোধে তোমাদিগেরও সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; সে বিবেচনায়, সীতাপরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। অতএব, তোমরা যত বল না কেন, ও যত অন্যায় হউক না কেন, আমি, সীতাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া, কুলের কলঙ্কবিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি। যদি তোমাদের আমার উপর দয়া ও স্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপন করিও না। হয় সীতাপরিত্যাগ, নয় প্রাণপরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

এই বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া, আমার আদেশ প্রতিপালন কর। ইতঃপূর্ব্বেই, সীতা তপোবনদর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; সেই ব্যপদেশে[১] তুমি তাঁহারে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস; তাহা হইলে আমার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখনও আমার আজ্ঞালঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস! কল্য প্রভাতেই, মদীয় আদেশের অনুযায়ী কার্য্য করিবে, কোনও মতে অন্যথা করিবে না। আর,

[১] ছলে, ছুতায়। আধুনিক প্রচলিত অর্থ 'প্রয়োজন', 'নিমিত্ত'।

আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাঁহারে, এ জন্মের মত, বিসর্জ্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্ব্বে, জানকী যেন, কোনও অংশে, এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।

এই বলিয়া, রামচন্দ্র, অবনত বদনে, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তিন জনে, জানকীর পরিত্যাগ বিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তিকরণে বিরত হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, বাষ্পবারিবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাম, সকলকে বিদায় দিয়া, বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। চারি জনেরই, যার পর নাই, অসুখে রজনীযাপন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলিলেন, সারথে! অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন; আর্য্যা জানকী তপোবনদর্শনে গমন করিবেন। সুমন্ত্র, আদেশপ্রাপ্তিমাত্র, রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি, তপোবনগমনের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া, রথের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ, সন্নিহিত হইয়া, আর্য্যে! অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা, বৎস! চিরজীবী ও চিরসুখী হও; এই বলিয়া, অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে, আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই। সীতা, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, বৎস! অদ্য প্রভাতে তপোবন-দর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই; সমস্ত

আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া আছি; রথ উপস্থিত হইলেই আরোহণ করি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর্য্যপুত্র, এমন সময়ে, আমার তপোবনগমনে আপত্তি করিবেন; তাহা না করিয়া, প্রসন্নমনে অনুমোদন করাতে, আমি কত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। বোধ হয়, আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম; সেই তপস্যার বলে, এমন অনুকূল পতি পাইয়াছি; আর্য্যপুত্রের মত অনুকূল পতি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতার কথা মনে হইলে, আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি দেবতাদের নিকট কায়মনোবাক্যে, নিয়ত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্য্যপুত্রকে পতি পাই। এই বলিয়া, সীতা প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিলেন, বৎস! বনবাসকালে, মুনিপত্নীদিগের সহিত আমার নিরতিশয় প্রণয় হইয়াছিল; তাঁহাদিগের দিবার নিমিত্ত, এই সমস্ত বিচিত্র বসন ও মহামূল্য আভরণ লইয়াছি।

এই বলিয়া, সীতা সেই সমুদায় লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন; এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন। সীতা, তপোবনদর্শনে যাইবার নিমিত্ত, এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, রথে আরোহণ করিলেন। অনধিক সময়েই, রথ, অযোধ্যা হইতে বিনির্গত হইয়া, জনপদে প্রবিষ্ট হইল। সীতা, নয়নের ও মনের প্রীতিপদ প্রদেশ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রীত মনে বলিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আমি যে এই সকল মনোহর প্রদেশ দেখিতেছি, ইহা কেবল আর্য্যপুত্রের প্রসাদের ফল; তিনি প্রসন্ন মনে অনুমোদন না করিলে, আমার ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনই অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, মুগ্ধস্বভাবা সীতার এইরূপ হর্ষাতিশয় দেখিয়া, এবং অবশেষে রামচন্দ্র

কিরূপ অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া, মনে মনে ম্রিয়মাণ হইলেন; অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিলেন; এবং, অনেক যত্নে, ভাবগোপন করিয়া, সীতার ন্যায় হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ দূর গমন করিলে পর, সীতা সহসা ম্লানবদনা হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস। এত ক্ষণ আমি মনের আনন্দে আসিতেছিলাম; কিন্তু সহসা আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে; সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে; অন্তঃকরণ যার পর নাই, ব্যাকুল হইতেছে; পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখের আবির্ভাব হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি আর্য্যপুত্র কেমন আছেন; হয় তাঁহার কোনও অশুভ ঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে; কিংবা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোনও অশুভ সংবাদ আসিয়াছে; তথায় গুরুজন কে কেমন আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, কোনও প্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; নতুবা, এমন আনন্দের সময়, এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবেক কেন? বৎস! কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে বল; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আর আমার তপোবনদর্শনে অভিলাষ হইতেছে না; আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আর্য্যপুত্র সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন; তাঁহার আসা হইল না কেন? রথে উঠিবার সময়, আহ্লাদে তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়াছিলাম। তাঁহার না আসাতে, আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। বৎস! কি করি বল; আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হইতেছে। রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্ব ক্ষণে, ঠিক এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল; আবার কি সেইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবেক?

না জানি, কি সর্ব্বনাশই ঘটিবেক। এক বার মনে হইতেছে, তপোবন-দর্শনে না আসিলে ভাল হইত; আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিলে, কখনও এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত না। এক একবার মনে হইতেছে, আর আমি এ জন্মে আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন; কিন্তু, অতি কষ্টে ভাব-গোপন করিয়া, শুষ্ক মুখে, বিকৃত স্বরে বলিলেন, আর্য্যে! আপনি কাতর হইবেন না; রঘুকুলদেবতারা আমাদের মঙ্গল করিবেন। বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কেহ নিকটে নাই; এ জন্যই, আপনকার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আপনি অস্থির হইবেন না; কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, উহার নিবৃত্তি হইবেক। মধ্যে মধ্যে, সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না। আপনি অত উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখশোষ[১] ও স্বরবৈলক্ষণ্য দর্শনে, অধিকতর কাতর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার ভাব দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি, কখনও, তোমার মুখ এরূপ ম্লান দেখি নাই। যদি কোনও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল। বলি, আর্য্যপুত্র ভাল আছেন ত? কল্য অপরাহ্নের পর, আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, এতক্ষণ এত অসুখ থাকিত না। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না। আপনার উৎকণ্ঠা ও অসুখ দেখিয়া, আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও অসুখ-বোধ করিয়াছিলাম; তাহাতেই আপনি আমার মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য লক্ষিত করিয়াছেন; নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে; উহা মনে করিয়া, আপনি বিরুদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না। যত

---

১ মুখবিবরের শুষ্কতা, শুকনা গলা।

ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহাদের রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল; সেই সময়ে, সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক[১] অস্তগিরি-শিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে, গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া উঠে। তৎকালে, তথায়, অতি অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিও সুস্থচিত্ত ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে, সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ অপসারণ হইল। লক্ষ্মণ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা, সে রাত্রি, সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। জানকী পথশ্রমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায়, সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং, ত্বরায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি যত ক্ষণ জাগরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ, সতর্ক হইয়া, তাঁহাকে নানা মনোহর কথায় এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, তিনি অন্য কোনও দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ, দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে তাহার আর কোনও লক্ষণ ছিল না।

প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা গোমতীতীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতা, বামে ও দক্ষিণে পরম রমণীয় প্রদেশ সকল নয়নগোচর করিয়া, যার পর নাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব দিন, তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠা ও অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না।

অবশেষে, রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া, সীতাকে, এ জন্মের মত, বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে

[১] সূর্য্য।

পারিলেন না। সীতা, দেখিয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; বহু কালের পর, ভাগীরথীর দর্শনলাভ করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে; তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন; ভগীরথ কত কষ্টে, গঙ্গা দেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া, তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া; লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন; এবং, গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্‌যোগ করিতে বলিতে লাগিলেন; কিন্তু, গঙ্গা পার হইলেই যে, দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন, এবং, কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই, তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া, তিনি অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া, এত ব্যাকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া, আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি, আসিবার সময়, আর্য্যপুত্রের কোনও অশুভ ঘটনা শুনিয়াছ, না অন্য কোনও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে;

কি হইয়াছে, শীঘ্র বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না; আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া, আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবেক, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে, আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল; তাহা হইলে, আজ আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! এই বলিয়া, উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন; অনন্তর, হস্তধারণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিলেন; এবং, তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে, তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যেই বা, তুমি মৃত্যুকামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে, তুমি কখনই এত আকুল ও এত অস্থির হও নাই। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদ্গতপ্রাণ; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যেই, কল্য অপরাহ্ণে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া, আমার জীবনদান কর; আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; না হইলে, এমন সময়ে, তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত

হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া, বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে, তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, সীতা তাঁহার হস্তে ধরিয়া, ব্যাকুল চিত্তে, কাতর বচনে, বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করিও না; আর্য্যপুত্র যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, ত্বরায় বল; তুমি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল। তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কি হইয়াছে, ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না; আমি, আর এক মুহূর্ত্ত, এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিব না; যাহা হয় বলিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই। যদি তিনি কুশলে থাকেন, আমার আর যে সর্ব্বনাশ ঘটুক না কেন, আমি তাহাতে তত কাতর হইব না। আমার মাথা খাও, তোমায় আর্য্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল; আর বিলম্ব করিলে, তুমি অধিক ক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি, যাতনা দিয়া, আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না।

সীতার এইরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন, অনেক যত্নে, চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিলেন; বলিলেন, আর্য্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন; সেই কারণে, পৌরগণ ও জানপদবর্গ, আপনকার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদকীর্ত্তন করিয়া থাকে। আর্য্য ইহা অবগত হইয়া, একবারে স্নেহ, দয়া,

ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদবিমোচনের নিমিত্ত, আপনকার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি, তপোবনদর্শনের ছলে লইয়া গিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া, লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও, শ্রবণমাত্র গতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা[১] কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি, অনেক যত্নে, জানকীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনালাভ করিয়া, উন্মত্তের ন্যায়, স্থির নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতের প্রায়, অধোবদনে, গলদশ্রু নয়নে, দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে, প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল; সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু, কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা, রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে, বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই, আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা কাহার মনে ছিল। বহু কালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগম হইলে, ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু,

[১] বায়ুতে আহত।

বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোমার মনে কি এতই ছিল।

এই বলিতে বলিতে, জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না; অনন্তর, দীর্ঘনিঃশ্বাস-পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, লক্ষ্মণ! নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, বিধাতার অপরাধ কি; সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূর্ব্ব জন্মে, কোনও পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম; সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া, ও মমতায় পরিপূর্ণ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন: তথাপি যে এমন সময়ে আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে, বহু কাল, বনবাসে ছিলাম; তাহাতে এক দিন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। সে যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন; আমি প্রকৃত কারণ বলিলে তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন, আমি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্ত্তে, তোমার সমক্ষে, জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার

জীবনধারণের ফল কি বল ? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয় ? আমি আশ্চর্য্যবোধ করিতেছি, আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিতেছে না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কাহারও নাই ; নতুবা, এখনও নির্গত হইতেছে না কেন ? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ; প্রাণত্যাগ হইলে, তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায় ; এ জন্যই জীবিত রহিয়াছি।

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে, সীতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে, হায় কি হইল বলিয়া, পুনরায় মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। সুশীল লক্ষ্মণ, দেখিয়া, শুনিয়া, নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন ; এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর[১] অশ্রুতপূর্ব্ব লোকানুরাগপ্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব্ব ভয়ানক অনর্থের মূল, এই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যদি ইতিপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোকবিগর্হিত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না। আমি, আর্য্যের আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত হইয়া, অতি অসৎ কর্ম্মই করিয়াছি। আমার মত পাষণ্ড ও পাষাণ-হৃদয় আর নাই ; নতুবা, এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিব কেন ? কেমন করিয়া, এমন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী পতিপ্রাণা কামিনীকে এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলাম ? যদি, আর্য্যের আদেশপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, আমায় এ জন্মের মত তাঁহার বিরাগভাজন ও জন্মান্তরে নিরয়গামী[২] হইতে হইত, তাহাও আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। সর্ব্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। হা বিধাতঃ ! কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে ? হা কঠিন হৃদয় ! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন ? হা কঠিন

[১] অদৃষ্টপূর্ব্ব। [২] নরকগামী।

প্রাণ! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? হা দগ্ধ কলেবর! তুমি এখনও সর্ব্ব অবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না কেন? আর আমি আর্য্যার এ অবস্থা দেখিতে পারি না। হা আর্য্য! তুমি যে এমন কঠিনহৃদয়, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্য্যার উদ্ধারসাধনে তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল? দশানন হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর, উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া, হাহাকার করিয়া বেড়াইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? তুমি অবশেষে এই করিবে বলিয়া, কি আমরা লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলাম? যাহা হউক, তোমার মত নির্দ্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে নাই।

কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ ও রামচন্দ্রের ভর্ৎসনা করিয়া, লক্ষ্মণ, উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ পূর্ব্বক, সীতার চৈতন্য-সম্পাদনে সযত্ন হইলেন। চেতনাসঞ্চার হইলে, সীতা, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর; আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন; আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; তুমি আর সে জন্য কাতর হইও না; শোকসংবরণ কর। আমার ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া, ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকট যাও। তিনি, আমায় বনবাস দিয়া, কাতর ও অস্থির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোকের নিবারণ ও চিত্তের স্থিরতা হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইবে; তাঁহাকে বলিবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, ক্ষোভ করিবার আবশ্যকতা নাই; তিনি সদ্বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; আমায় পরিত্যাগ করিয়া, তিনি রাজধর্ম্মপ্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন জানি; তিনি যে কেবল লোকাপবাদের ভয়ে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তিনি যেন, শোকশূন্য ও ক্ষোভশূন্য হইয়া, প্রশস্ত মনে, প্রজাপালনে নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন।

তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যদিও আমি, লোকাপবাদভয়ে, অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম, যেন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একবারে অপসারিত না হই। আমি, তপোবনে থাকিয়া, এই উদ্দেশে, ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন। আর, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে, যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য করেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর; যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকারবহির্ভূত নই।

এই বলিয়া, একান্ত শোকাকুল হইয়া, সীতা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সে জন্য তত কাতর নহি; পাছে আর্য্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয়, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইতেছি। তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিবে, তিনি যেন শোকসংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত হন। আমার ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, যথার্থ বটে; কিন্তু সে জন্যে, আমি তাঁহাকে অণুমাত্র দোষ দিব না; আমার যেমন অদৃষ্ট, তেমনই ঘটিয়াছে; তজ্জন্য তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। বৎস! তোমায় আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও, তাঁহারে একাকী থাকিতে দিবে না; একাকী থাকিলেই, তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। এই বলিয়া, লক্ষ্মণের হস্তে ধরিয়া, সীতা বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে করুণ বচনে বলিলেন, তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। তপোবনে থাকিয়া, যদি লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবেক।

এই বলিতে বলিতে, সীতার নয়নযুগল হইতে, অবিরল ধারায়, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদীয় পতিপরায়ণতার সম্পূর্ণ-

প্রমাণপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া লক্ষ্মণের শোকপ্রবাহ প্রবল বেগে প্রোচ্ছলিত হইয়া উঠিল; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সীতা সান্ত্বনাবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! শোকাবেগ-সংবরণ করিয়া, ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও, আর বিলম্ব করিও না। বারংবার এইরূপ বলিয়া, তিনি লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার নিমিত্ত নিরতিশয় ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মণ, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, আর্য্যে! আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্য্যের একান্ত আজ্ঞাবহ; যখন যে আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হই। প্রাণান্তস্বীকার করিয়াও, অগ্রজের আজ্ঞাপ্রতিপালন করা অনুজের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। আমি, সেই অনুজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া, আর্য্যের এই বিষম আজ্ঞার প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যে পাষাণহৃদয়ের কর্ম্ম করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিলাম। প্রার্থনা এই, আমার উপর আপনকার যে অপরিসীম স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য[১] না হয়। আর আর্য্যের আদেশ অনুসারে, এরূপ নৃশংস আচরণ করিয়া, আমি যে বিষম অপরাধ করিলাম, কৃপা করিয়া, আমার সেই অপরাধের মার্জ্জনা করিবেন।

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া, সীতা বলিলেন, বৎস! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে, দেবতার নিকট, নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই; তুমি চিরজীবী হও। তুমি, অযোধ্যায় গিয়া, আর্য্যপুত্রের চরণে আমার প্রণাম জানাইবে। ভরত, শত্রুঘ্ন, ও আমার ভগিনীদিগকে স্নেহসম্ভাষণ বলিবে; শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন

[১] পরিবর্ত্তন।

করিলে তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদিত করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দি। আমি চিরদুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই; সুতরাং, আমার যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু এই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি কষ্ট না পায়। তাহারা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইবেক; যাহাতে ত্বরায় তাহাদের শোকনিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে সতত যত্ন করিও; তাহারা সুখে থাকিলেও, অনেক অংশে আমার দুঃখনিবারণ হইবেক। তাহাদিগকে বলিবে, আমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি; আমার জন্যে, শোকাকুল হইবার ও ক্লেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, স্নেহভরে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ, বাষ্পাকুল লোচনে ও শোকাকুল বচনে, আর্য্যে! আমার অপরাধমার্জ্জনা করিবেন, অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া, পুনরায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা, অল্প ক্ষণেই, ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং, কিয়ৎ ক্ষণ, নিষ্পন্দ নয়নে, জানকীরে নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে, রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যত ক্ষণ সীতাকে দেখিতে পাওয়া গেল লক্ষ্মণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও চিত্রার্পিত প্রায় রথে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইল। তখন লক্ষ্মণ, আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাও, রথ নয়নপথবহির্ভূত হইবামাত্র, যূথবিরহিত কুররীর[১] ন্যায়, উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

১ চিল জাতীয় পক্ষী।

সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা, শব্দ অনুসারে, ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। দেখিয়া, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে, যার পর নাই, কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা, ফল কুসুম কুশ সমিধ[১] আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীসন্নিহিত অটবীবিভাগে[২] পর্যটন করিতেছিলাম; অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণা কামিনী, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কে, কি কারণে রোদন করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; কিন্তু, তাঁহার কাতরভাবের অবলোকন ও বিলাপবাক্যের আকর্ণন দ্বারা, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা, সাহস করিয়া, তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। অবশেষে, আপনাকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনায়, ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এক্ষণে, যাহা বিহিত বোধ হয়, করুন।

মহর্ষি, ঋষিকুমারদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন; এবং, সীতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, সস্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর, প্রশান্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎসে! বিলাপ করিও না; কি কারণে তুমি আমার তপোবনে আসিয়াছ, তোমার আসিবার পূর্ব্বেই, আমি তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি রাজা জনকের দুহিতা, কোশলাধিপতি মহারাজ

[১] বিকল্পে সমিৎ—যজ্ঞ কাষ্ঠ। [২] বনাঞ্চলে

দশরথের পুত্রবধূ, এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের মহিষী। রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে, চলচিত্ত ও সদসৎপরিবেদনাবিহীন[১] হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, তোমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। সীতা, সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিলেন; এবং, সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষিকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া, গললগ্ন বসনে, তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। বাল্মীকি, রঘুকুলতিলক তনয় প্রসব কর, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া, বলিলেন, বৎসে! আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আমার আশ্রমে চল; আমি, আপন তনয়ার ন্যায়, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তথায় থাকিয়া, তুমি কোনও বিষয়ে কোনও ক্লেশ পাইবে না। জনপদবাসীরা, বন, এই শব্দ শুনিলে ভয়াকুল হয়; কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। ঋষিদের তপস্যার প্রভাবে, হিংস্র জন্তুরাও, স্বভাবসিদ্ধ হিংসাপ্রবৃত্তি দূরীকৃত করিয়া পরস্পর, সৌহৃদ্য ভাবে কালহরণ করে। তপোবনের এরূপ মহিমা যে, স্বল্প কাল অবস্থিতি করিলেই, চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়। তোমায় আসন্নপ্রসবা দেখিতেছি। প্রসবের পর, অপত্য-সংস্কারবিধি[২] যথাবিধি সমাহিত হইবেক, কোনও অংশে অঙ্গহীন হইবেক না। সমবয়স্কা মুনিকন্যারা তোমার সহচরী হইবেন; তাঁহাদের সহবাসে তোমার বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন হইবেক। বিশেষতঃ, তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু, সুতরাং, আমার তপোবনে থাকিয়া, তোমার পিতৃগৃহবাসের সকল সুখ সম্পন্ন হইবেক; আমি অপত্যনির্ব্বিশেষে, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অতএব, বৎসে! আর বিলম্ব করিও না, আমার অনুগামিনী হও।

এই বলিয়া, সীতারে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহর্ষি তপোবনে প্রবেশ করিলেন; এবং, সকল বিষয়ের সবিশেষ বলিয়া দিয়া, সমবয়স্কা মুনিকন্যাদের হস্তে সীতার ভারার্পণ করিলেন। মুনিকন্যারা,

---

[১] সৎ-অসৎ বিবেচনাধীন। [২] সন্তানের জাতকর্ম্মাদি-ব্যবস্থা।

তদীয়সমাগমলাভে, পরম প্রীতি ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং, যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সীতাকে বনবাস দিয়া, রাম যার পর নাই অধৈর্য্য ও শোকাভিভূত হইলেন ; এবং, আহার, বিহার, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, অন্যের প্রবেশপ্রতিষেধ পূর্ব্বক, একাকী, আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন ; এবং পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ, উভয়ের এক মন, এক প্রাণ ; কেবল শরীরমাত্র বিভিন্ন ছিল। সীতা যেরূপ সাধুশীলা ও সরলান্তঃকরণা, রামও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ ছিলেন ; সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, পতিহিতৈষিণী, ও পতিসুখে সুখিনী, রামও সেইরূপ সীতাগতপ্রাণ, সীতাহিতাকাঙ্ক্ষী ও সীতাসুখে সুখী ছিলেন। গৃহে রাজভোগে থাকিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখে সময় অতিবাহিত হইত, বনবাসে, পরস্পর সন্নিধান বশতঃ, বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন হইয়াছিল। বনবাস হইতে বিনিবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ও অনুরাগ শত গুণে প্রগাঢ় হইয়া উঠে। উভয়েই উভয়কে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে, নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। রাম, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের[১] ভয়ে, সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ; সুতরাং সীতানির্ব্বাসনশোক তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

রামের আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না। কেনই আমি রাজবংশে

লোকবিরাগ সঞ্চিত হইবে, জন্মিয়া উঠিবে, এইভয়ে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম; কেনই আমি পুনরায় রাজ্যের ভারগ্রহণ করিলাম; কেনই আমি দুর্ম্মুখকে, পৌরগণের ও জানপদবর্গের অভিপ্রায়পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, নিয়োজিত করিলাম; কেনই আমি লক্ষ্মণের উপদেশ অনুসারে না চলিলাম; কেনই আমি, নিতান্ত নৃশংস হইয়া, সীতারে বনবাস দিলাম; কেনই আমি, নিরতিশয় ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভারে বিসর্জ্জন দিয়া, সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম; কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব; কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব; প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া অপেক্ষা, আমার আত্মঘাতী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল; ইত্যাদি প্রকারে, তিনি, অহোরাত্র, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ শোকানলে নিরন্তর জ্বলিত হইয়া, তাঁহার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই, অর্দ্ধাবশিষ্ট হইল।

তৃতীয় দিবস, মধ্যাহ্ন সময়ে, লক্ষ্মণ, নিতান্ত দীনভাবাপন্ন মনে, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন; এবং, সর্ব্বাগ্রে রামচন্দ্রের বাসভবনে গমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, গদগদ বচনে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিয়া আসিল। রাম, অবলোকন ও আকর্ণনমাত্র, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও, বহু যত্নে, তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ শূন্য নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিয়া, হাহাকার ও অতিদীর্ঘনিঃশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে; আমি, তাঁহার বিরহে, কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব; আর যে যাতনা সহ্য হয় না; এই বলিয়া, লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই, অধৈর্য্য হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বাষ্পবিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, অতি কষ্টে, স্বীয় শোকাবেগের সংবরণ

করিয়া, রামের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, লক্ষ্মণের মুখে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল; ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া, তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া রহিলেন; এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে, দুঃসহ শোকভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ, পুনরায় পরম যত্নে, রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন; এবং, তাঁহার তাদৃশী দশা দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না। শোকাপনোদনের কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি, এইরূপ আলোচনা করিয়া, বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, আর্য্য! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া, ভবাদৃশ মহানুভাবের পক্ষে, কদাচ উচিত নহে। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। যাদৃশ বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে; নতুবা আপনি, অকারণে অথবা সামান্য কারণে, আর্য্যাকে বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা কাহার মনে ছিল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চির-দিনের জন্যে নহে; বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের, কোনও কালে, অন্যথা ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমুদয়ের আলোচনা করিয়া, আপনকার শোকসংবরণ করা উচিত। বিশেষতঃ আপনি সকল লোকের হিতানুশাসন কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন; সে জন্যেও আপনকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের একান্ত শোকাভিভূত হওয়া কদাচ উচিত হয় না। প্রাকৃত লোকেই শোকে মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। অতএব, ধৈর্য্য

অবলম্বন করুন; এবং, অন্তঃকরণ হইতে অকিঞ্চিৎকর শোককে নিষ্কাশিত করিয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন। আর, আপনকার ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে. আর্য্যারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আর্য্যাকে গৃহে রাখিলে, প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করিবেক, কেবল এই আশঙ্কায়, আপনি তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন। এক্ষণে, তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হইলে, সে আশঙ্কার নিরাস হইতেছে না। সুতরাং, যে দোষের পরিহার-মানসে, আপনি ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, সেই দোষ পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিতেছে; আর্য্যার পরিত্যাগে কোনও ফলোদয় হইতেছে না। আর. ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি যত দিন শোকাভিভূত থাকিবেন, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালন-কার্য্য উপেক্ষিত হইলে, রাজধর্ম্মপ্রতিপালন হয় না। অতএব, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কার্য্য নয়।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! তোমার উপদেশবাক্য শুনিয়া, আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, আমি, যে উদ্দেশে, জানকীরে বনবাস দিয়া রাক্ষসের ন্যায়, নিরতিশয় নৃশংস আচরণ করিলাম; এক্ষণে তাঁহার জন্যে শোকাকুল হইলে, তাহা বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ, শোকের ধর্ম্মই এই, তাহাতে অভিভূত হইলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শোকাভিভূত ব্যক্তি অভীষ্টলাভ করিতে পারে না, কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা বশতঃ প্রত্যবায়গ্রস্ত[১] হয়। অতএব, এই মুহূর্ত্ত অবধি, আমি শোকসংবরণে যত্নবান্ হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিতেছি,

---

[১] পাপগ্রস্ত, অনিষ্টের ভাগী।

আর আমি শোকে অভিভূত হইব না। প্রজালোকে, কোনও ক্রমে, আমায় শোকাভিভূত বোধ করিতে পারিবেক না। অমাত্যদিগকে বল, কল্য অবধি, রীতিমত রাজকার্য্যপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; তাঁহারা যেন, যথাকালে সমস্ত আয়োজন করিয়া, কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকেন।

এই বলিয়া, রামচন্দ্র, অবনত বদনে, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজত্ব কি বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ; লোকে, কি সুখভোগের লোভে, রাজ্যাধিকারলাভের কামনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া আমায়, এ জন্মের মত, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। যার পর নাই নৃশংস হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিলাম। এক্ষণে, তাঁহার জন্যে যে অশ্রুপাত করিব, তাহারও পথ নাই। রাজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে, আমাকে স্নেহ, দয়া, মমতা, ও ভদ্রতায় বিসর্জ্জন দিতে হইল। উত্তরকালীন লোকেরা, নিতান্ত নৃশংস অথবা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া, আমার গণনা ও কলঙ্কঘোষণা করিবেক।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন; এবং, ধৈর্য্যাবলম্বন ও শোকাবেগসংবরণ পূর্ব্বক পর দিন প্রভাত অবধি, যথানিয়মে রাজকার্য্যপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে, তিনি রাজকার্য্যপর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন বটে; এবং লোকেও, বাহ্য আকার দর্শনে, বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড় ধৈর্য্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ শোকের সংবরণ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ নিরন্তর দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ, বিষদিগ্ধ[১] শল্যের ন্যায়, তাঁহাকে সতত মর্ম্মবেদনা-প্রদান করিতে লাগিল। কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, তিনি

[১] বিষমিশ্রিত।

জানকীরে নির্ব্বাসিত করেন ; এক্ষণেও, কেবল সেই লোকবিরাগ-সংগ্রহের ভয়েই, বাহ্য আকারে শোকসংবরণ করিলেন। যৎকালে তিনি, নৃপাসনে আসীন হইয়া, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায়, স্থির চিত্তে রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য ধৈর্য্যশালী পুরুষ আর নাই। কিন্তু, রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেই, তিনি যৎপরোনাস্তি বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষ্মণ সদা সন্নিহিত থাকিতেন, এবং সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু, লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে, তাঁহার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। ফলতঃ, তিনি, কেবল হাহাকার, বাষ্পমোচন, আত্মভর্ৎসন, ও সীতার গুণকীর্ত্তন করিয়া বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন। এই রূপে দুর্নিবার সীতাবিবাসন[১]শোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া, তিনি দিন দিন কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, রাজকার্য্য ব্যতীত, আর কোনও বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না।

এ দিকে, কিয়ৎ দিন পরে, জানকী দুই যমজ কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি যথাবিধানে জাতকর্ম্মপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা, সীতার সন্তানপ্রসব দর্শনে, যার পর নাই হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে অতি মহান্ আনন্দকোলাহল হইতে লাগিল। সীতা, দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্যলাভ করিলে, মুনিতনয়রা, উল্লসিত মনে, প্রীতিপূর্ণ বচনে বলিলেন, জানকি! আজ বড় আনন্দের দিন ; সৌভাগ্যক্রমে, তুমি পরম সুন্দর কুমারযুগল প্রসব করিয়াছ। সীতা, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন ; কিন্তু, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শোকভরে নিতান্ত অভিভূত

[১] সীতা নির্ব্বাসন।

হইয়া, অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা, সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকি! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন? বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এ জন্য, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; অনন্তর, উচ্ছলিত শোকাবেগের কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, বলিলেন, অয়ি প্রিয়সখিগণ! তোমরা কি কিছুই জান না, যে আমি, এমন আনন্দের সময়, কি জন্যে শোকাকুল হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্রপ্রসব করিলে, স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু, কেমন অবস্থায়, আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার যে, এ জন্মের মত, সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে না থাকিত, তাহা হইলে, যে মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শুনাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে আমি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম; অথবা অন্য কোনও প্রকারে আত্মঘাতিনী হইতাম। আমায় কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়।

এই বলিয়া, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া, জানকী, অনিবার্য্য বেগে, বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা, সীতার ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! শোকাবেগের সংবরণ কর; যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু অধিক দিন, তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেক না। রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল; তাহাতেই তিনি, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, ঈদৃশ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছেন। আমরা পিতার মুখে শুনিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে; অতএব শোকসংবরণ কর। মুনিতনয়াদিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, সীতার নয়নযুগল হইতে, প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে মুনিতনয়াদিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তাঁহারাও, শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে, সদ্যঃপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, জানকী এককালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কুমারেরা, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায়, দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, জননীর নয়নের ও মনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দসম্পাদন করিতে লাগিল। যখন তাহারা আধ আধ কথায়, মা মা বলিয়া আহ্বান করিত; যখন তাহাদের সন্নিবেশিতমুক্তাকলাপসদৃশ[১] দন্তগুলি দৃষ্টিগোচর হইত; যখন তাহাদের অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; যখন তিনি, তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন; তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন; তাঁহার সর্ব্ব শরীর, অমৃতাভিষিক্তের ন্যায়, শীতল, ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুসলিলে পরিপ্লুত হইত।

কুশ ও লব পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি, তাহাদের চূড়াকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বালকেরা, অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, ও প্রতিভার প্রভাবে, অল্প কাল মধ্যেই, বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে বাল্মীকি, রাবণবধ পর্য্যন্ত লোকোত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া, রামায়ণ নামে বহুবিস্তৃত মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম, তিনি সেই অমৃতরসবর্ষী অপূর্ব্ব মহাকাব্য, রামচন্দ্রের পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহারা, স্বল্প সময়েই সেই বিচিত্র গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিল; এবং, সীতার সমক্ষে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিয়া, তাঁহার শোকনিবৃত্তি করিতে লাগিল। একাদশ বর্ষে, মহর্ষি, তাহাদের উপনয়নসংস্কার

[১] সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত মুক্তার মত।

সম্পন্ন করিয়া, বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরা, সংবৎসর কালেই, সমগ্র বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারলাভ করিল।

কুশ ও লবের বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর হইল; কিন্তু তাহারা কে, এ পর্য্যন্ত তাহারা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। তাহারা ঋষিকুমার ও তাহাদের জননী ঋষিপত্নী, তাহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। ফলতঃ, জানকী যে ভাবে তপোবনে কালযাপন করিতেন; তাঁহাকে দেখিলে, কেহ ঋষিপত্নী ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারিত না; এবং তাহাদেরও দুই সহোদরের আচার ও অনুষ্ঠান নয়নগোচর করিলে, ঋষিকুমার ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা জানকীকে জননী বলিয়া জানিত; কিন্তু তিনি যে মিথিলাধিপতির তনয়া, অথবা কোশলাধিপতির মহিষী, তাহা জানিতে পারে নাই। বাল্মীকি, যত্নপূর্ব্বক, এই বিষয় তাহাদের বোধবিষয় হইতে সঙ্গোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং তপোবনবাসীদিগকে এরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ, ভ্রমক্রমেও, তাহাদের সমক্ষে, এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত না; আর, সীতাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিও যেন, কোনও ক্রমে, তনয়দিগের নিকট আত্মপরিচয়প্রদান না করেন; তদনুসারে, সীতাও, তাহাদের নিকট, কখনও, স্বসংক্রান্ত কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহারা রামায়ণে রামের ও সীতার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের জননী যে জনকনন্দিনী, অথবা রামের সহধর্ম্মিণী, তাহা জানিতে পারে নাই; সুতরাং ঐ মহাকাব্যে নিজ জনক জননীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এই রূপে, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত, কুশ ও লব আত্মস্বরূপপরিজ্ঞানে[১] সম্পূর্ণরূপ অনধিকারী ছিল।

জননীর অনির্ব্বচনীয়স্নেহসহকৃত প্রযত্ন ব্যতিরেকে, যত দিন

[১] আত্মপরিচয়লাভে।

পর্য্যন্ত, সন্তানের জীবনরক্ষা সম্ভাবিত নয়; তাবৎ কাল জানকী সর্ব্ব-শোকবিস্মরণ পূর্ব্বক, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কুশ ও লবের লালন পালনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইলে, মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিল না। তখন তিনি, তাহাদের বিষয়ে এক প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া, ঋষিপত্নীদিগের ন্যায়, তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীনমঙ্গলকামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তথাপি, এক ক্ষণের জন্যে, সীতার অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা করিতেন; ভ্রমক্রমেও ভাবিতেন না যে, সে বিষয়ে রামচন্দ্রের কোনও অংশে কিছুমাত্র দোষ আছে। বস্তুতঃ, রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের নিকট, কায়মনোবাক্যে, নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন, যেন রামচন্দ্র কুশলে থাকেন; এবং জন্মান্তরে, তিনি যেন রামচন্দ্রেরই সহধর্ম্মিণী হয়েন। তিনি, দিবাভাগে তপস্যাকার্য্যে ব্যাপৃত ও সখীভাবাপন্ন ঋষিকন্যাগণে পরিবৃত থাকিয়া, কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতেন; কিন্তু, যামিনী-যোগে একাকিনী হইলেই, তাঁহার দুর্নিবার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তিনি, কেবল রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন হইয়া, ও অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া, যামিনীযাপন করিতেন। ফলকথা এই, সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে অকাতরে বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কালসহকারে, সকলেরই শোক শিথিল হইয়া যায়; কিন্তু জানকীর শোক সর্ব্বক্ষণ নবীভাবাপন্ন ছিল। এইরূপে, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর, দুর্বিষহ শোকদহনে নিরন্তর অন্তর্দ্দাহ হওয়াতে, জানকীর অলৌকিক

রূপ ও লাবণ্য এককালে অন্তর্হিত, এবং কলেবর চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া, বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব, শ্রবণমাত্র, সাধুবাদপ্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! উত্তম সংকল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি; অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পূর্ব্বতন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। রাজ্যভারগ্রহণ করিয়া, যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সম্পাদিত হইলেই, আপনকার রাজ্যাধিকার আর কোনও অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! ইনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে; এক্ষণে, তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই, কর্ত্তব্যনিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুজেরা, তৎক্ষণাৎ, আন্তরিক অনুমোদনপ্রদর্শন করিলেন। তখন রাম বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধিয়া

বলিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনকার কি অনুমতি হয়। বশিষ্ঠদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামচন্দ্র অনুজদিগকে বলিলেন, দেখ, যখন কর্ত্তব্য স্থির হইল তখন আর অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তোমরা সত্বর সমস্ত আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত, ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর। সময়নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, সমস্ত নগরে ও জনপদে এ বিষয়ের ঘোষণা করিয়া দাও। লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদ্বর্গের পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্যে, অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে, আমি পরম সুখী হইব। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যাবতীয় ঋষিদিগের নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি, অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গিয়া, যজ্ঞভূমিনির্ম্মাণের উদ্যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি, আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যের যথোচিত আয়োজন করিয়া, তৎসমুদয় সত্বর তথায় পাঠাইয়া দাও। দেখ, যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্তে, নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; অতএব, যত্নপূর্ব্বক, সমস্ত বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন, কোনও বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন, কাহারও কোনও অংশে ক্লেশ বা অসুবিধা না ঘটে। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী; তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু, আমি এক বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম বলিলেন,

আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতির আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব, জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা হইবেক। শ্রবণমাত্র, রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নয়নের অশ্রুমার্জ্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধ মাত্র হয় নাই; এক্ষণে, কি কর্ত্তব্য, উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব, অনেক ক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া, বলিলেন, মহারাজ! পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে, আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সকলেই এককালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাস দিয়া, জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। সীতার মোহিনী মূর্ত্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে, উপস্থিত কার্য্যের অনুরোধে পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দারপরিগ্রহ বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, সে বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া, মৌন ভাবে, অবনত বদনে, অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এই রূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্ব্বাগ্রে

নৈমিষক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন; এবং, সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমির নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ অন্তরে, পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের জন্যে, তাহাদের অবস্থোচিত অবস্থিতিস্থান[১] নির্ম্মিত করাইলেন। লক্ষ্মণও, অনতিবিলম্বে, অশেষবিধ অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যা যান প্রভৃতির সমবধান করিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের মোচন পূর্ব্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্য নৈমিষারণ্যপ্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে লাগিল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া, অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি, যজ্ঞদর্শনমানসে, ক্রমে ক্রমে, নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিলেন; বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে[২] নিযুক্ত হইলেন; সুগ্রীব অপরাপর নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশবৎসরপূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর কুশ ও লব, রাজাধিরাজতনয় হইয়া যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোনও মতে উচিত নহে; তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম, এ উভয়ের শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা পুনরায় পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক। অথবা, অন্য উপায় উদ্ভাবিত করিবার প্রয়োজন কি? শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার

[১] অবস্থা অনুযায়ী বসিবার স্থান। [২] পরিচারকের কার্য্যে, সেবাকার্য্যে।

আশ্রমে আনাইয়া, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধরক্ষা করিবেন। এই স্থির করিয়া, ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকিয়া, মহর্ষি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয়; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, পূর্ণগর্ভা অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; এখন, আমার কথায়, তাঁহারে সহজে গৃহে লইবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোনও সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, কোনও মতে, উচিত কল্প হইতেছে না। এই দুই বালক, উত্তর কালে, অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক; এই সময়ে, পিতৃসমীপে নীত হইয়া, রাজনীতি বিষয়ে বিধিপূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদারক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ, রাজা রামচন্দ্র, আমি কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া, অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষা বা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ পাঠান উচিত। অথবা, একেবারেই তাঁহার নিকটে সংবাদ না পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

এক দিন, মহর্ষি, সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধির সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে, এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত নিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পিত করিল। মহর্ষি, পত্রপাঠ করিয়া, পরমপ্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্তে বিদায় দিলেন; এবং এক শিষ্যের উপর তাঁহার আহারাদিসমাধানের ভারপ্রদান করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তাহার সিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া

দিলেন। এক্ষণে, বিনা প্রার্থনায়, কার্য্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রামের ও উহাদের দুই সহোদরের আকৃতিগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে উহাদিগকে তাঁহার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক; আর, অবলোকনমাত্র, রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক; এবং, তাহা হইলেই, আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন; কল্য প্রত্যূষে প্রস্থান করিব; মানস করিয়াছি, অপরাপর শিষ্যের ন্যায়, তোমার পুত্রদিগকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন। মহর্ষি, স্বীয় কুটীরে প্রতিগমন করিয়া, শিষ্যদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন; এবং কুশ ও লবকে বলিলেন, দেখ, এ পর্য্যন্ত জনপদের কোনও ব্যাপার তোমাদের নয়নগোচর হয় নাই। রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবেক; এবং, তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া, তোমরা, অনেক অংশে, লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক গুণপরম্পরার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম নয়নগোচর করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত, রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত[১] হওয়াতেই, রাম তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া, তিনি একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ, সেই সীতার পক্ষে, একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার উপর তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোনও অংশে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা, নিতান্ত আকুলচিত্তে, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কুশ ও লব তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, মা! মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞদর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা, যার পর নাই, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা, প্রজারঞ্জনের অনুরোধে, নিজ প্রেয়সী

১ নিরুপায়।

মহিষীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেক? সে বলিল, যজ্ঞসমাধানের জন্যে বশিষ্ঠদেব পুনরায় দারপরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই; সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীর কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেক। দেখ মা! এমন মহাপুরুষ কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজধর্ম্ম-প্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্ম্মপ্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা, ইতিহাসগ্রন্থে, অনেক অনেক রাজার ও অনেক অনেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; কিন্তু কেহই, কোনও অংশে, রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সীর পরিত্যাগ, ও সেই প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে, যাবজ্জীবন, দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণ পড়িয়া অবধি আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিব; এক্ষণে, সেই বাসনা পূর্ণ হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই। সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন; তাহারাও দুই সহোদরে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মহর্ষিসমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া, যে অতিবিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণগোচর করিয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত, এবং, তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্ব্বাপিত হইল। তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল; এবং, নির্ব্বাসনের ক্ষোভ তিরোহিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈমিষপ্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস, অপরাহ্ণ সময়ে, তথায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠদেব, সাতিশয় সমাদর-প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব, দূর হইতে রামচন্দ্রকে লোচনগোচর করিয়া, চমৎকৃত ও পুলকিত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে; দেখিলেই, অলৌকিক গুণসমুদয়ের অসাধারণ আধার বলিয়া, স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেমন অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিকগুণসমুদয়ে পূর্ণ। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, মহর্ষির প্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণের পরিকীর্ত্তনে নিয়োজিত হওয়াতে, তদীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা জন্মিয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমরা নয়নের চরিতার্থতালাভ করিলাম।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, নিরূপিত দিবসে, মহাসমারোহে, সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীন, দরিদ্র, ও অনাথ, পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায়, যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্য্যাপ্ত অন্ন, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থ, ভূমিকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত ভূমি, প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত, চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত, বাদ্য হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশ ভূষায় সুশোভিত। সকলেরই মুখে আমোদের ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল; কাহারও অন্তঃকরণে দুঃখের

বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি, বা অন্যাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমরা কখনও এরূপ যজ্ঞ দেখি নাই। অতীতবেদী[১] ব্যক্তিরাও বলিতে লাগিলেন, কোন কালে, কোনও রাজা, ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ সহকারে, যজ্ঞ করিতে পারেন নাই; রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

এই রূপে, প্রত্যহ, মহাসমারোহে, যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল; এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ, সভায় সমবেত হইয়া যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহের আতিশয্যদর্শনে, নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক দিন, মহর্ষি বাল্মীকি, বিরলে বসিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি, যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া, এত দিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম; এ পর্য্যন্ত, অভিপ্রেতসাধনের কোনও উপায় অবলম্বন করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে, কি প্রণালীতে, কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি। উহাদের দুই সহোদরকে, সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায়, লইয়া যাই; অথবা, রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই; এবং, বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, এবং কুশ ও লবের পরিচয় দিয়া, সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। মহর্ষি, মনে মনে এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া, পরিশেষে স্থির করিলেন, কুশ ও লবকে রামায়ণগান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিয়া বেড়াইলে, ক্রমে রাজার গোচর হইবেক; তখন তিনি অবশ্যই, স্বীয় চরিতের

[১] অতীত জ্ঞানী, 'বেদী' অর্থ 'জ্ঞানী'।

শ্রবণমানসে, উহাদিগকে স্বসমীপে নীত করিবেন, এবং তাহা হইলেই, বিনা প্রার্থনায়, আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবেক।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি কুশ ও লবকে বলিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! তোমরা প্রতিদিন, সময়ে সময়ে, সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাস কুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপ[১]-মণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে, এবং সভাভবনের অভিমুখভাগে, মনের অনুরাগে, বীণাসংযোগে রামায়ণের গান করিবে। যদি রাজা, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তোমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান, এবং তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর, যত ক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোনও প্রকারে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন বা অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। রাজা সকলের পিতৃস্থানীয়; অতএব, তোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ পিতৃভক্তিপ্রদর্শন করিবে। যদি, সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া, রাজা পুরস্কারস্বরূপ অর্থপ্রদানে উদ্যত হন, লোভবশ হইয়া, কদাচ অর্থগ্রহণ করিবে না; বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া, অর্থগ্রহণে অসম্মতিপ্রদর্শন করিবে; বলিবে, মহারাজ! আমরা বনবাসী, তপোবনে থাকিয়া, ফল মূল দ্বারা, প্রাণধারণ করি, আমাদের অর্থের প্রয়োজন নাই। আর, যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, বলিবে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য।

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া, মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর, তাহারা দুই সহোদরে তদীয় আদেশ ও উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, বীণাসহযোগে, মধুর স্বরে, স্থানে স্থানে রামায়ণগান করিতে আরম্ভ করিল। যে শুনিল, সেই, মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ, রামের চরিত্র

১ শামিয়ানা।

অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যার পর নাই চিত্তহারিণী; তৃতীয়তঃ, কুশ ও লবের রূপমাধুরী দৃষ্টিগোচর হইলে, সকলকেই মোহিত হইতে হয়; তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে, উহার সহিত তুলনা করিলে, কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়; চতুর্থতঃ, বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদয়ের সমবায় থাকে, তাহা শুনিয়া, কাহার চিত্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়।

কিঞ্চিৎ কাল পরেই, অনেকেই রামের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার, বীণাযন্ত্রসহযোগে, আপনকার চরিত্রগান করিতেছে; যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। আমরা, জন্মাবচ্ছিন্নে, কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ! মানবকলেবরে কেহ কখনও এমন রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক আর কি বলিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভবস্বীকার করিবেক। আর, তাহারা যে কাব্যের গান করিতেছে, তাহা কাহার রচিত, বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব ললিত রচনা কখনও শ্রবণগোচর করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া, আপনকার সমক্ষে গান করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে, ও তাহাদের গান শুনিলে, নিঃসন্দেহ, মোহিত হইবেন।

শ্রবণমাত্র, রামের অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত[১] কৌতূহলরস সঞ্চারিত হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাহাদের দুই সহোদরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা, রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, অতি বিনীত ভাবে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র,

[১] অতিরিক্ত।

রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস, অথবা বিষাদবিষ, সহসা সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইল, ইহার অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎ ক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, সেই দুই কুমারের উপর দৃষ্টিবিন্যাস করিয়া রহিলেন; এবং, অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, তাহার অনুধাবন করিতে না পারিয়া, চিত্রার্পিতের প্রায়, উপবিষ্ট রহিলেন।

কুমারেরা, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, রামচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা করিল; এবং, তদীয় আদেশ অনুসারে, সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া, যথোচিত বিনয় ও নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি জন্যে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন? তাহারা সন্নিহিত হইলে, তদীয় কলেবরে নিজের ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন; কিন্তু, তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল; এ জন্যে, অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্যসংবরণ করিয়া, সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায়, তাহাদিগকে বলিলেন, শুনিলাম, তোমরা অপূর্ব্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তোমাদের প্রশংসা করিতেছেন। এ জন্যে, আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিয়ৎ ক্ষণ গান করিয়া, আমায় প্রীতিপ্রদান কর। তাহারা বলিল, মহারাজ! আমরা যে কাব্যের গান করিয়া থাকি, তাহা বহুবিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের পবিত্র চরিত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা, আপনকার সমক্ষে, ঐ কাব্যের কোন্ অংশের গান করিব, আদেশ করুন।

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত এত চঞ্চল এবং সীতানির্ব্বাসনশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জার ভয়ে আর ধৈর্য্য অবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া, বিজনপ্রদেশসেবনের নিমিত্ত, নিরতিশয়

উৎসুক হইয়াছিলেন ; এ জন্যে বলিলেন, অদ্য তোমরা ইচ্ছামত যে কোনও অংশের গান কর ; কল্য প্রভাত অবধি, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া, তোমাদের মুখে সমস্ত কাব্যের গান শুনিব। তাহারা, যে আজ্ঞা, মহারাজ! বলিয়া, সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক, মোহিত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদপ্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছ ? তাহারা বলিল, মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত ; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত [illegible] তাঁহার নিকটেই সমস্ত শিক্ষা করিয়াছি। তখন, রাম বলিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। আজ তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে ; তোমাদিগকে আর অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না ; এখন তোমরা আবাসে গমন কর।

এই বলিয়া, তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় দিয়া, রাম সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন ; এবং, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া, আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তান দেখিলে, লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহের ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই ; আমারও ইহাদিগকে দেখিয়া, ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এইরূপ হইবার কোনও কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার ; আর, যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি। আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও অসহনীয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে,

হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোনও দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে, তেমন অবস্থায়, প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া, নির্বিঘ্নে সন্তানপ্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালন পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না।

এই বলিয়া, একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন; অনন্তর, শোকাবেগসংবরণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, কিন্তু উহাদের আকার প্রকার দেখিলে, ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আর, অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলে, সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িত রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, চিবুক, ওষ্ঠ, ও দন্তপংক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি আকস্মিক ঘটনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবেক? আর, ইহারা বলিল, বাল্মীকির তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে; আমিও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, সীতারে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিবে। হয় ত, মহর্ষি, কারুণ্যবশতঃ, সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; তথায় তিনি এই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া, সকলে এরূপ বোধ করিতেন, জানকী গর্ভযুগলধারণ করিয়াছেন। এ সকলের আলোচনা করিলে, আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা, আমি, মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া, অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি, নৃশংস রাক্ষসের ন্যায়, নিতান্ত নির্দ্দয় ও নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে, সম্পূর্ণ নিরপরাধে, বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। হা প্রিয়ে! তুমি, তেমন সুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া, কেন এমন দুঃশীলের ও কুটিলহৃদয়ের হস্তে

পড়িয়াছিলে। আমি যখন, তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও, অনায়াসে বনবাস দিতে, এবং বনবাস দিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে?

এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে, দুর্দ্ধর শোকভরে অভিভূত হইয়া, রাম বিচেতনপ্রায়[১] হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারি-বিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন, বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সীতা তথায় এই দুই যমজ তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্প দিন মাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন নহে। বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে, এ বয়সে উপনয়ন হইবেক কেন? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অষ্টম বর্ষে ইহাদের সংস্কারসম্পাদন করিতেন। ইহা ভিন্ন, উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্ব্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়কুমার হয়, তাহা হইলে, ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না; কারণ, অন্য ক্ষত্রিয়সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা কি? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে, ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, যদি প্রিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়। প্রিয়া

[১] অচেতন।

পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও, আমার সর্ব্ব শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘ বিয়োগের পর, যখন প্রথম সমাগম হইবেক, তখন, বোধ হয়, আমি আহ্লাদে অধৈর্য্য হইব; প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম-সমাগমসময়ে, উভয়েরই আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবল বেগে বাহিত হইতে থাকিবেক। কিয়ৎ ক্ষণ, এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, তিনি হর্ষবাষ্প-বিসর্জ্জন করিলেন। পর ক্ষণেই, এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে, প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে, কেমন করিয়া তাঁহারে এ মুখ দেখাইব। অথবা, তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার অপরাধ-মার্জ্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র, তাঁহার চরণে ধরিয়া, বিনীত বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল, পাছে প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে পাঠাইয়াছি; এক্ষণে, যদি তাঁহারে গৃহে লই, তাহা হইলে, পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এত কাল, আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহযাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।

এই বলিয়া, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অপ্রসন্ন মনে অবস্থিত রহিলেন; অনন্তর, সহসা উদ্ভূত রোষাবেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থাপ্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গৃহে লইলে, যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক; আর আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি[১] করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কে কখন, আমার ন্যায়, আত্মবঞ্চন করিয়াছে। প্রথমেই

[১] ইচ্ছানুবৃত্তি, ইচ্ছা অনুসারে গমন।

প্রিয়ারে বনবাসে দেওয়া নিতান্ত নির্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গৃহে লইব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া, প্রিয়াসমভিব্যাহারে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়াবিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা, তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস, আমার পক্ষে, সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।

রাম, আহার ও নিদ্রার পরিহার পূর্ব্বক, এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, রজনীযাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বন করিয়া, অতি অদ্ভুত কাব্যের রচনা করিয়াছেন; তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণবয়স্ক শিষ্য, অতি মধুর স্বরে, সেই কাব্যের গান করে; কল্য প্রভাতে, তাহারা রাজসভায় গান করিবেক; সেই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত হইয়াছিলেন। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণলালসার বশবর্ত্তী হইয়া, সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে, রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, এবং সুগ্রীব, বিভীষণ আদি সুহৃদ্বর্গ, তাঁহার বামে ও দক্ষিণে, যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি রাজপরিবার, অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে, পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এই রূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া, সমস্ত লোক অভিনব কাব্যের ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও

নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ ও লব সমভিব্যাহারে, সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র, সভামণ্ডপে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। যাঁহারা, পূর্ব্ব দিন, কুশ ও লবকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, স্বসমীপে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিলেন। বাল্মীকি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র, সভাস্থ সমস্ত লোক, এককালে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্তে পৃথক্ স্থান স্থিরীকৃত ছিল; তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত্তে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, একান্ত উৎসুক চিত্তে, কখন্ আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বাল্মীকি, সভার সর্ব্বাংশে নয়নসঞ্চারণ করিয়া, রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! সকলেই শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, কুশ ও লব বীণাযন্ত্র-সহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্ব্বেই কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগ বর্ণিত আছে, তোমরা অদ্য ঐ সকল অংশেরই গান করিবে। তদনুসারে তাহারা কিয়ৎ ক্ষণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তদীয় নয়নযুগল হইতে, প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দুই সহোদরকে যত দেখিতে লাগিলেন, ততই, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ইঁহারাও, তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতিরিক্ত, সভাস্থ সমস্ত লোক, একবাক্য হইয়া, বলিতে লাগিলেন,

কি আশ্চর্য্য ! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে, রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম, কুমারবয়স অবলম্বন পূর্ব্বক দুই মূর্ত্তি ধরিয়া, ঋষিকুমারের বেশপরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বয়সে, রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপ লাবণ্যের যেরূপ মাধুরী ছিল, ইহাদের অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক, মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া, একতান মনে সঙ্গীতশ্রবণ, ও অনিমিষ[১] নয়নে তাহাদের রূপনিরীক্ষণ, করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! ইহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা, শ্রবণমাত্র, বিনয়নম্র বচনে বলিল, মহারাজ ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি ; যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল মাত্র আহার ও বল্কল মাত্র পরিধান করিয়া কালযাপন করি ; আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি ! আমরা, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, আপনকার চরিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম ; আজ আপনকার সমক্ষে তাহার পরিচয় দিয়া, আমাদের সেই যত্ন ও সেই পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দর্শনে, সকলে এককালে চমৎকৃত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, কুশ ও লব সীতার তনয় বলিয়া কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে, হা বৎসে জানকি ! ইহা বলিয়া, ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে, একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ সঙ্গীতশ্রবণ করিয়া, সকলেরই হৃদয়ে সীতার

[১] 'অনিমিষ' বা 'অনিমেষ' দুই-ই সংস্কৃতে সিদ্ধ

শোক এত প্রবল ভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে, সকলেই নিতান্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, নিরতিশয় অধীরা হইয়া, উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, ঐ দুই কুমারকে কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও; ক্রোড়ে লইয়া, এক বার আমি উহাদের মুখচুম্বন করিব; উহারা আমার জানকীর তনয়; উহাদিগকে দেখিয়া, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই; ক্রোড়ে লইয়া, এক বার উহাদের মুখচুম্বন করিলে, আমার জানকী-শোকের অনেক নিবারণ হইবেক। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। উহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র, যেন কেহ আমায় বলিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে; সেই অবধি উহাদের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি, বার বৎসরে, সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু, উহাদিগকে দেখিয়া, আমার সীতাশোক পুনরায় নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ, কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই জানি না। এই বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া, কৌশল্যা পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে, সযত্ন হইয়া, পুনরায় তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন, কৌশল্যা, নিরতিশয় অধৈর্য্য হইয়া, বলিতে লাগিলেন, এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না; না হয় কেহ এক বার লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া, আমার নাম করিয়া বলুক; লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবেক।

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া, অরুন্ধতীর আদেশ অনুসারে, সমীপবর্ত্তিনী প্রতিহারিণী[১], লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া,

[১] স্ত্রী রক্ষী।

সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, কৌশল্যার অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিল। লক্ষ্মণ, কৌশলক্রমে, সে দিবস সেই পর্য্যন্ত সঙ্গীতক্রিয়া রহিত করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন; এবং, কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহভরে, বারংবার উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন, এবং হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ; এই বলিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে, সুমিত্রা, উর্ম্মিলা প্রভৃতি সকলেই, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত, বিলাপ, ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অবাক্ হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, সন্দেহভঞ্জনমানসে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের জনক জননীর নাম কি? তাহারা, অতি বিনীত ভাবে, স্বস্বনামকীর্ত্তন করিয়া বলিল, আমাদের পিতা কে, তাহা আমরা জানি না; এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে দেখি নাই; আমাদের জননী আছেন, তিনি তপস্বিনী; কিন্তু এক দিনও, আমরা তাঁহার নাম শুনি নাই, কেহ আমাদিগকে বলিয়া দেয় নাই; আমরাও তাঁহাকে বা অন্য কাহাকেও কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য; তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। আকুল চিত্তে এই সকল কথা শুনিয়া, অনেক অংশে, কৌশল্যার সংশয়াপনোদন হইল। কিন্তু, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার জননীর আকৃতি কিরূপ? কুশ ও লব তদীয় আকৃতির যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, এককালে সকলের দৃঢ় নিশ্চয় হইল; এবং কৌশল্যা প্রভৃতি সমস্ত রাজ-পরিবারের শোকসিন্ধু, অনিবার্য্য বেগে, উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎ

ক্ষণ পরে, কৌশল্যা কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননী কেমন আছেন? তাহারা বলিল, তাঁহাকে সর্ব্বদাই জীবন্মৃতপ্রায় দেখিতে পাই; বিশেষতঃ, তিনি দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, অধিক দিন বাঁচিবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া, সকলেই যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি একবার মহর্ষি বাল্মীকিকে এই স্থানে আন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, মহর্ষি বাল্মীকি, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে, যথোচতি ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া, পরম সমাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর, কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনকার এই দুই শিষ্য কে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন। বাল্মীকি, যে দিন লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আইসেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া, রামের বিরহে সীতার যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া, সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং কুশ ও লব তাঁহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিনের পর আত্মপরিচয় পাইয়া, কুশ ও লবের অন্তঃকরণে নানা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে বলিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! পিতামহীদের ও পিতৃব্যপত্নীদিগের চরণবন্দনা কর। তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কেকয়ী, ও সুমিত্রার,

এবং ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর, মহর্ষি বলিলেন, তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ নামে যে মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তনপাঠ করিয়াছ, তিনি এই; ইনি তোমাদের তৃতীয় পিতৃব্য; এই বলিয়া লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। তাহারা, লক্ষ্মণ এই শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র, বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে, পদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া, দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে, তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে, কৌশল্যা লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি ত্বরায় রামকে ও বশিষ্ঠদেবকে এখানে আন। তদনুসারে, লক্ষ্মণ, অল্প ক্ষণ মধ্যে, রাম ও বশিষ্ঠদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে, তাঁহাদের নিকট, কুশ ও লবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন এবং সীতা যে তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, তাহাও বলিলেন। কুশ ও লবের বিষয়ে রামচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হইল। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি, অপ্রমেয়[১] বাৎসল্যভরে, নিষ্পন্দ নয়নে, কুশ ও লবের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, কৌশল্যা সপুত্রা সীতার পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌশল্যা, তদীয় মৌনাবস্থানকে সম্মতিদান স্থির করিয়া, সীতার আনয়নের নিমিত্তে বাল্মীকির নিকটে প্রার্থনা করিলেন। বাল্মীকি, অবিলম্বে বাসকুটীরে গমন করিয়া, কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান সমভিব্যাহারে, আপন এক শিষ্যকে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি জানকীরে এই যানে আরোহণ করাইয়া, আমার বাসকুটীরে লইয়া আসিবে।

ক্রমে ক্রমে, সমবেত নিমন্ত্রিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণগায়ক বাল্মীকিশিষ্যেরা রাজতনয়; সীতা, পরিত্যাগের পর, বাল্মীকির

---

[১] অপরিমেয়।

আশ্রমে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছেন; তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা তাঁহারে গৃহে লইবেন; তাঁহার আনয়নের নিমিত্তে লোক প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমাদের রাজা অতি অব্যবস্থিতচিত্ত; যদি জানকীরে পুনরায় গৃহে লইবেন, তবে পরিত্যাগ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? তখনও যে জানকী, এখনও সেই জানকী; তখনও যে কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও সে কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; বড় লোকের রীতি চরিত্র বুঝা ভার।

সীতার পরিগ্রহ বিষয়ে রাম একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু, এই সকল কথা কর্ণপরম্পরায় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, পুনরায় চলচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে জানকীরে গৃহে লইলে, প্রজালোকে আর আপত্তির উত্থাপন করিবেক না। কিন্তু, অদ্যাপি তাহাদের হৃদয় হইতে সীতার চরিত্রসংক্রান্ত সংশয় অপনীত হয় নাই দেখিয়া, তিনি বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে, সমবেত সমস্ত লোকের সমক্ষে, সীতা স্বীয় শুদ্ধচারিতা প্রমাণসিদ্ধ করিলে, রাম তাঁহাকে গৃহে লইবেন। রামের আদেশ অনুসারে, লক্ষ্মণ এই কথা বাল্মীকির গোচর করিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, বাল্মীকি, অবিলম্বে, রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং, সীতা যে সম্যক্ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সীতার শুদ্ধচারিতা বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি, রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া, নিতান্ত পরায়ত্ত হইয়াছি। আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন, প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম; কোনও কারণে তাহাতে অণুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, ইহ লোকে

অকীর্ত্তিভাজন ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। প্রজালোকের অন্তঃকরণে সীতার চরিত্র বিষয়ে বিষম সংশয় জন্মিয়া আছে; সে সংশয় অপসারিত না হইলে, আমি কি রূপে গ্রহণ করি, বলুন। আমি, সীতার পরিত্যাগদিবস অবধি, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি; কি রূপে এত দিন জীবিত রহিয়াছি, বলিতে পারি না। নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, আমায় সীতারে নির্ব্বাসিত করিতে হইয়াছে। এক বার মনে করিয়াছিলাম, প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয় হউক, আমি আর তাহাদের অনুরোধে সীতাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তাহাতে রাজধর্ম্মের প্রতিপালন হয় না; সুতরাং, সে বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না। আর বার ভাবিয়াছিলাম, না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া, রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইব; তাহা হইলে, আর আমার জানকীপরিগ্রহের কোনও প্রতিবন্ধক থাকিবেক না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে উপায় অবলম্বন করাও শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল না। আমি জানকীর প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহ ঘোরতর অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়াছি; এ যাত্রা, আমি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে জীবন-যাপন করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি এক্ষণে যে বিষম মানসিক কষ্টে কালহরণ করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ বোধ করি।

এই বলিয়া, একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া, রাম অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারিবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক, বিনয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া, বাল্মীকিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন। যদি তাঁহার পরিগ্রহ সর্ব্বসম্মত

হয় তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিব। সর্ব্বসম্মত না হইলে, তাঁহাকে, কোনও অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা, প্রজাবর্গের সন্দেহনিরাকরণ করিতে হইবেক। বাল্মীকি, অগত্যা সম্মত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে বাসসদনে[১] প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে, সীতা, কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া, এবং মহর্ষির প্রেরিত শিষ্যের মুখে তদীয় আদেশ শুনিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বুঝি বিধি, সদয় হইয়া, এত দিনের পর, আমার দুঃখের অবসান করিলেন। যখন ঠাকুরাণী শিবিকা পাঠাইয়াছেন, তখন আমি পুনরায় পরগৃহীতা হইব, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই জন্যই আজ আমার বাম নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। আমি আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতা জানি; নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, তিনি আমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর, তিনিও আমার বিরহে সেইরূপ কাতর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমার প্রতি স্নেহের কোনও অংশে খর্ব্বতা ঘটিত, তাহা হইলে, তিনি কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহে বিমুখ হইতেন না। তিনি, সহধর্ম্মিণীস্থলে আমার প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া, স্নেহের পরা কাষ্ঠা[২] দেখাইয়াছেন, এবং আমার সকল শোকের ও সকল ক্ষোভের নিবারণ করিয়াছেন। পুনরায় যে আমার অদৃষ্টে আর্য্যপুত্রের সহবাসসুখ ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

এইরূপ বলিতে বলিতে আহ্লাদভরে, জানকীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরে শতগুণ বলাধান[৩] ও চিত্তে অপারমিত স্ফূর্তির ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। পুনরায় পরিগৃহীতা হইলাম ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয়কন্দর

---

[১] বাসগৃহে। [২] পরা—চরম, চূড়ান্ত; কাষ্ঠা—সীমা; অর্থাৎ চূড়ান্ত রূপ।
[৩] বলসঞ্চার।

অভূতপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আশার আশ্বাসনী[১] শক্তির ইয়ত্তা নাই। তিনি, আশার উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন; রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, স্নেহভরে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না, অভিমানভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন প্রথম-সমাগমক্ষণে, উভয়েই জড়প্রায় হইয়া, স্থির নয়নে উভয়ের বদন-নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া, পরস্পর দীর্ঘবিরহকালীন দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে, অপরিজ্ঞাত রূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল; এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের সম্মুখে নীত হইয়া তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলে, তাঁহারা বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাঁহাকে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া, শোকভরে কতই পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি, শ্বশ্রূদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেবরেরা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে, আর্য্যে! প্রণাম করি, ইহা বলিয়া অভিবাদন করিলেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন তাঁহার ভগিনীরা আসিয়া প্রণাম করিলেন; এবং, দীর্ঘবিয়োগের পর, পরস্পরসন্দর্শনে শোকপ্রবাহ উচ্ছলিত হওয়াতে, সকলে মিলিয়া, গলদশ্রু লোচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার

[১] আশ্বাস দিবার ক্ষমতা।

বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে ; তিনি, রামের বামে বসিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে সহধর্ম্মিণীকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

এইরূপ অনেকরূপ অনুভব করিতে করিতে, আহ্লাদভরে পুলকিতকলেবরা হইয়া, জানকী শিবিকায় আরোহণ করিলেন ; এবং, পর দিবস সায়ং সময়ে, নৈমিষে উপনীতা হইলেন। বাল্মীকি বলিলেন, বৎসে ! রাজা রামচন্দ্র তোমার পুনর্গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। কল্য, যৎকালে, তিনি সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময়ে, সর্ব্বসমক্ষে, আমি তোমায় তাঁহার হস্তে সমর্পিত করিব। বাল্মীকির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করিলে, কোনও ব্যক্তি, সাহস করিয়া, সভামধ্যে অসম্মতিপ্রদর্শন করিতে পারিবেক না। এ জন্য, তিনি, শুদ্ধচারিতার প্রমাণপ্রদর্শন আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, এ কথার উল্লেখ মাত্র করিলেন না। অনন্তর, জানকী, বিরলে বসিয়া, কুশ ও লবের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্বীয় পরিগ্রহ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তসংশয়া হইলেন ; এবং, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, প্রতি ক্ষণে প্রভাত-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; সমস্ত রাত্রি, একবারও, নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি, স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া, সীতা, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিত দেখিয়া, রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতিকষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন ; এবং না জানি, আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি, আসনপরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃ স্বরে বলিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশল রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ,

এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছে; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদ-শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদন-প্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

ইহা বলিয়া, বাল্মীকি বিরত হইলে, সভামণ্ডপে অতিমহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নরপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতা দেবীরে পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যার পর নাই পরিতোষলাভ করিব। কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোক, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম, এত ক্ষণ, বিষম সংশয়ে কালযাপন করিতেছিলেন; এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতার পরিগ্রহ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি নাই। এ জন্যে তিনি নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি, অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে বলিলেন, বৎসে জানকি! তোমার চরিত্র বিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই; অতএব তুমি, কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া, সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রতি ক্ষণেই পরিগ্রহপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া, বাতাহতা লতার ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইলেন।

জননীর তাদৃশী দশা দেখিয়া, অতিমাত্র কাতর হইয়া, কুশ ও লব উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম, অতিমহতী লোকানুরাগ-

প্রিয়তার সহায়তায়, এ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া, এবং কুশ ও লবের আর্ত্তনাদ শ্রবণ-গোচর করিয়া, অতিদীর্ঘনিঃশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্ব্বক, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্চ্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, হা বৎসে জানকি! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতার ভগিনীরাও, দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াও, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদনে তৎপর হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। বাল্মীকিও, সীতার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, অশেষপ্রকারে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছেন।

সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা, মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্ম্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে, সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া, কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

১ ॥ বিদ্যাসাগরের জীবনী

মেদিনীপুর জেলার (তৎকালে হুগলী) অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামের অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয় ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার।

বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। তিনি জনক-জননীর প্রথম সন্তান। দারিদ্র্য বিদ্যাসাগরের পুরুষানুক্রমিক ছিল বলেই তাঁর পিতার বাল্যকালে বিশেষ লেখা-পড়া হয়নি—উপরন্তু মাত্র ১৪।১৫ বছর বয়সে তাঁকে চাকুরীর চেষ্টায় কলকাতায় চলে আসতে হয়। পাঁচ বছর বয়েসে বিদ্যাসাগর বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু করেন। তিন বছরের মধ্যেই এখানের পাঠ শেষ হলে তিনি পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার আশায় কলকাতায় চলে আসেন (১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ)।

কলকাতায় কিছুদিন থাকবার পর ঈশ্বরচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁকে বীরসিংহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মাস তিনেক পরে তিনি আবার কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল যে ছেলে সংস্কৃতশাস্ত্রে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করে দেশে ফিরে চতুষ্পাঠী করুক। সেই অনুযায়ী তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয় এবং তিনি সেখানে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি প্রতি পরীক্ষায় নিরঙ্কুশ কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন। নানা রকম বৃত্তি ও পুরস্কার পেয়ে মোট ১২ বছর ৫ মাস সংস্কৃত কলেজের গৌরবময় ছাত্র-জীবন অতিবাহিত করেন এবং ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর প্রশংসাপত্র পেয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী ইংরেজীও তিনি প্রয়োজন মত শিখে নিয়েছিলেন।

পাঠ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। এর আগে ১১ বছর বয়েসে ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন হয় এবং প্রায় ১৪ বছর বয়েসে দিনময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কিছুদিন চাকরী করার পর ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকরীতে চলে আসেন। কিন্তু এখানে একবছর সাড়ে তিন মাস কাজের পর সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বিদ্যাসাগর ঐ চাকরী ছেড়ে দেন। কিন্তু যেখান থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা বিদ্যাসাগর সব সময়েই মনে মনে পোষণ করতেন। তাই ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি যখন ঐ কলেজের অধ্যাপকের পদে চাকরীর জন্যে ডাক পেলেন, তখন আর তা প্রত্যাখ্যান করলেন না। এর কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র মাসে ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (২২শে জানুয়ারী ১৮৫১)। অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগর এই কলেজের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার সাধন করেছিলেন, যার ফল অত্যন্ত সুদূর প্রসারিত হয়েছিল।

কিন্তু শুধু শিক্ষক হিসেবে কলেজের উন্নতি সাধনের মধ্যেই তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, পাঠ্য-পুস্তক রচনা এবং সর্বোপরি বাংলা গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কারের সূত্র ধরে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবা-বিবাহকে আইন-সম্মত করেন। অধিকন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে একমাত্র শিক্ষার আলোই পারে এই হতভাগ্য জাতিকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাতে। তাই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সরকারী সহযোগিতায় অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা দান এবং বিস্তার করতে গিয়ে শিশুপাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 'ঋজুপাঠ', 'বোধোদয়', 'কথামালা' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ রচনাবলীর তালিকা দিয়েছি।

ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো দরিদ্র, অসহায় ও আর্তের প্রতি করুণা বিতরণ। এই মহান গুণের জন্যে আজও তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। কত বিধবার সংসার, কত অনাথ বালকের ভরণ-পোষণ ও লেখা-পড়া যে তাঁরই সাহায্যে চলতো তার আর ইয়ত্তা নেই। এই গুণের জন্যেই দেশবাসী তাঁকে 'দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর' বলে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

অত্যন্ত পরিশ্রম, বন্ধু-আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু এবং পরিচিত জনের কাছ থেকে অকৃতজ্ঞ ব্যবহার তাঁর মন ও শরীর ক্রমেই দুর্বল করে দিয়েছিল। তাই তিনি নগরের কোলাহল ছেড়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় কার্মাটারে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু শরীর আর বইল না। শেষে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুলাই ৭০ বছর বয়সে বাংলার এই শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহলোক ত্যাগ করেন।

২॥ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপঞ্জী

ঈশ্বরচন্দ্র কলম ধরেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে—এখানেও তাঁর সংস্কারক ব্যক্তিত্বের ভিন্নতর প্রকাশ। তাই তাঁর মৌলিক রচনা নেই বললেও হয়। কিন্তু প্রতিভা এমন জিনিষ যে তা যাকেই স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে তোলে। বিদ্যাসাগরেরও সেই প্রতিভাই ছিল—তাই তাঁর সংকলিত, অনূদিত, ভাবানূদিত, সম্পাদিত গ্রন্থ বা পাঠ্যপুস্তক কোন কিছুই মৌলিক সৃষ্টির ব্যক্তিত্ব বা রস-বিবর্জিত হয় নি। এখানেই বিদ্যাসাগরের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। নিচে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তালিকা দিলাম—এবং এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সাহিত্য সাধক-চরিতমালা' (১৮)-কেই অনুসরণ করেছি :

১। **বেতাল-পঞ্চবিংশতি** (১৮৪৭) হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' গ্রন্থের অনুবাদ।

২। **বাঙ্গালার ইতিহাস :** দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮) জনক্লার্ক মার্শম্যানের ইংরেজী গ্রন্থ Outline of the History of Bengal for the use of Youths in India-র শেষ ন'-টি অধ্যায় (১১-১৯) অনুসরণে রচিত।

৩। **জীবন চরিত :** (১৮৪৯, সেপ্টেম্বর)। চেম্বার্স প্রণীত 'Exemplary Biography-র থেকে ন'-জন মনীষীর জীবনকথা এতে অনূদিত হয়েছে।

৪। **বোধোদয় :** শিশুশিক্ষা : চতুর্থ ভাগ (১৮৫১, এপ্রিল)। চেম্বার্স সাহেবের Rudiments of Knowledge নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে বালিকাদের পাঠোপযোগী করে রচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় : 'বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সংকলিত হইল, পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে।'

৫। **সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা :** (১৮৫১, নভেম্বর)।

৬। **ঋজুপাঠ :** প্রথম ভাগ (১৮৫১, নভেম্বর)। দেব নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত এবং বাংলা ভূমিকা সম্বলিত। পঞ্চতন্ত্র এবং মহাভারতের কিছু কাহিনী এতে সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ : (১৮৫২ মার্চ)। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কিয়দংশের সংকলন।

তৃতীয় ভাগ (১৮৫২, ডিসেম্বর)। আরও কিছু সংস্কৃত ক্ল্যাসিক্‌স্‌-এর সংকলন।

৭। **সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব :** (১৮৫৩, মার্চ) কলকাতার বীটন সোসাইটিতে পঠিত (১৮৫১)।

৮। **ব্যাকরণ কৌমুদী :** প্রথম ভাগ (১৮৫৩)।
: দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩)।
: তৃতীয় ভাগ (১৮৫৪)।
: চতুর্থ ভাগ (১৮৬২)।

৯। **শকুন্তলা :** (১৮৫৪, ডিসেম্বর)। ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' নাটকের উপাখ্যান-ভাগের সার সংকলন।

১০। **বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব :** (১৮৫৫, জানুয়ারী)।

১১। **ঐ :** দ্বিতীয় প্রস্তাব (১৮৫৫, অক্টোবর)।[১]

১২। **বর্ণ পরিচয় :** প্রথম ভাগ (১৮৫৫, এপ্রিল)।
: দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫, জুন)।

১৩। **কথামালা :** (১৮৫৬, ফেব্রুয়ারী)। ইংরেজী Æsop's Fables-এর কয়েকটি গল্পের বঙ্গানুবাদ।

১৪। **চরিতাবলী :** (১৮৫৬, জুলাই)। কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির জীবন চরিতের পরিচয়।

১৫। **মহাভারত :** উপক্রমণিকা ভাগ (১৮৬০, জানুয়ারী)।

---

১ এই পুস্তিকা দু'টির ইংরেজী ও মারাঠী অনুবাদও হয়েছিল।

১৬। **সীতার বনবাস** ঃ (১৮৬০, এপ্রিল)। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বেশির ভাগই ভবভূতি-প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে নেওয়া হয়েছে, বাকী পরিচ্ছেদগুলি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অনুসরণে রচিত হয়েছে।

১৭। **আখ্যান মঞ্জরী** ঃ (১৮৬৩, নভেম্বর) এর মাত্র ছ'-টি গল্প নিয়ে এবং কতকগুলি নতুন গল্প যোগ করে 'আখ্যানমঞ্জরী ঃ প্রথম ভাগ' (১৮৬৮, ফেবরুয়ারী) এবং প্রথম বারের গল্পের সঙ্গে আরও সাতটি নতুন গল্প যোগ করে 'আখ্যান মঞ্জরী ঃ দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৬৮, ফেবরুয়ারী) প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৮, জুন মাসে 'আখ্যান মঞ্জরী ঃ দ্বিতীয় ভাগ' নামে যে বইটি প্রকাশিত হয়, তার 'বিজ্ঞাপনে' লেখা হয় ঃ 'এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।'

১৮। **শব্দমঞ্জরী** ঃ বাংলা অভিধান (১৮৬৪)।

১৯। **ভ্রান্তিবিলাস** ঃ (১৮৬৯, ডিসেম্বর)। সেক্সপীয়রের Comedy of Errors-এর ভাবানুবাদ।

২০। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার** (১৮৭১, আগষ্ট)।

২১। **ঐ ঃ দ্বিতীয় পুস্তক** (১৮৭৩, এপ্রিল)।

২২। **বামনাখ্যানম্** (১৮৭৩)। মধুসূদন তর্কপঞ্চানন লিখিত কিছু সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ।

২৩। **নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস** (১৮৮৮, এপ্রিল)। বিদ্যাসাগরকে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত্তীলক প্রবৃত্তির বলে অভিযোগ করলে তিনি এই পুস্তিকা লেখেন।

২৪। **পদ্য সংগ্রহ** ঃ প্রথম ভাগ (১৮৮৮, জুলাই)।
ঃ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯০)

২৫। **সংস্কৃত রচনা** (১৮৮৯, নভেম্বর)। ছাত্রাবস্থায় লেখা।

২৬। **শ্লোকমঞ্জরী** (১৮৯০, মে)। কয়েকটি উদ্ভট শ্লোকের সংগ্রহ পুস্তক।

২৭। **বিদ্যাসাগর চরিত** [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত : ১৮৯১, সেপ্টেম্বর]
স্ব-রচিত এই জীবন-চরিতে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ পর্যন্ত আত্মজীবন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

২৮। **ভূগোলখগোল বর্ণনম্** [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত : ১৮৯২, এপ্রিল]
সংস্কৃত শ্লোকাকারে ভূগোল ও খগোল বিষয়ক গ্রন্থ।

২৯। **রামের রাজ্যাভিষেক** [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত: ১৯০৯]।
অসম্পূর্ণ রচনা।

: বেনামী রচনা :

বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক প্রশ্নে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটি বিতর্কমূলক পুস্তিকা রচনা করেন। সেখানে তিনি সব সময়েই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। পুস্তিকাগুলি হলো :

৩০। **অতি অল্প হইল** (১৮৭৩, মে) : কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য।

৩১। **আবার অতি অল্প হইল** (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর) : ঐ।

৩২। **ব্রজবিলাস**[1] (১৮৮৪, নভেম্বর) : ঐ ।

৩৩। **বিধবা বিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিনী সভা** (১৮৮৪, নভেম্বর)
: কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ।

৩৪। **রত্নপরীক্ষা** (১৮৮৬, আগস্ট)। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য।

: গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা :

৩৫। **বাল্যবিবাহের দোষ** (১৮৫০)। : প্রথম সংখ্যা', 'সর্বশুভকরী'।

৩৬। **নীতিবোধ** (১৮৫১)। : রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত নীতিবোধ গ্রন্থের কয়েকটি রচনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের।

৩৭। **প্রভাবতীসম্ভাষণ** [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত : ১৮৯২]। 'সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।'

৩৮। **মাতৃভক্তি** (১৮৯৩)। 'সখা'—ছোটদের পত্রিকা।

৩৯। **'ছাগলের বুদ্ধি'** (১৮৯৪) : ঐ।

৪০। **শব্দ-সংগ্রহ** (১৯০১)। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ, ৭৩-১৩০।

---

১ দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৭) এর নামকরণ করা হয় 'বিনয় পত্রিকা'।

এগুলি ছাড়াও বিদ্যাসাগর ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষার কিছু কিছু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সম্পাদনা করে ও প্রকাশ করেন। সেখানেও তাঁর প্রতিভা ও সাহিত্য-রসবোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৩॥ 'শকুন্তলা'প্রসঙ্গে

উৎস: আমরা জানি যে শকুন্তলার উপাখ্যানটির মূল রয়েছে মহাভারতের আদি পর্বে একসপ্ততিতম অধ্যায় থেকে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের মধ্যে। মহাকবি কালিদাস সেই কাহিনী সূত্রকে অবলম্বন করে তাঁর অমর নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই নাটকটিকে বাঙালী শিক্ষিত জন এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য অনুবাদ করেন; এবং মোটামুটিভাবে কালিদাসের কাব্যের রস, কাহিনী-কাঠামো এবং চরিত্র-চিত্রণ-কৌশল অক্ষুণ্ণ রেখে বিদ্যাসাগর এই শকুন্তলা গ্রন্থটি রচনা করেন। নিচে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা গ্রন্থটির কাহিনী স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা হলো:

কাহিনী-সার: মহারাজ দুষ্মন্ত যুদ্ধ শেষে রাজধানী ফেরার পথে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে এসে উপস্থিত হন। সেখানে কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই দু-জনে দু-জনের প্রেমে আবদ্ধ হন এবং শকুন্তলার দুই সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহায়তায় তাঁদের গান্ধর্ব মতে বিবাহ হয়। মহর্ষি কণ্ব তখন আশ্রমে অনুপস্থিত—তাই শকুন্তলার এই বিবাহ সংবাদ দুই সখি ছাড়া আর কেউ-ই জানলো না।

কিছুদিন পরে রাজা রাজধানী ফিরে চলে গেলেন এবং পরে শকুন্তলাকে পূর্ণ মহিষীর মর্যাদায় রাজান্তঃপুরে নিয়ে যাবেন বলে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। যাবার সময় শকুন্তলাকে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় দিয়ে যান—প্রেমের অভিজ্ঞান-স্বরূপ।

কিছু কাল পরে কণ্ব আশ্রমে ফিরে এসে শকুন্তলা-বিবাহ বার্তা জানতে পারেন এবং তার গর্ভে মহারাজার সন্তান আগমনের সংবাদ পেয়ে, নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করে, দুই শিষ্য এবং গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্তের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এর আগে একদিন শকুন্তলা আশ্রমে যখন পতিচিন্তায় লুপ্তজ্ঞান-প্রায় হয়েছিলেন তখন কোপনস্বভাবা ঋষি দুর্বাসা তার কাছে পাদ্যার্ঘ যাচ্ঞা করেন।

কিন্তু শকুন্তলা বাহ্যজ্ঞান রহিত হওয়ায় ঋষির আগমন বার্তা জানতে পারে নি। ফলে, দুর্বাসা তাকে অভিশাপ দেন যে, সে যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁকে অবহেলা করেছে, সে তাকে ভুলে যাবে। পরে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার অনুরোধে ঋষি কিছুটা শান্ত হন এবং বলেন যে শকুন্তলা যদি রাজাকে অভিজ্ঞান দেখাতে পারে, তবে রাজার সব কথা আবার মনে পড়বে।

শকুন্তলা পতিগৃহে যাবার সময়ে চক্রতীর্থে তাঁর হাতের আংটিটি খুলে পড়ে যায়। একটি বড় রুই মাছ সেটিকে খেয়ে ফেলে। পরে রাজসভায় শকুন্তলা উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে শাপ-প্রভাবে চিনতে পারেন না। এবং শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হন। ঋষিদ্বয় ও গৌতমী তাকে ছেড়ে দিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। রাগে দুঃখে অনুতাপে শকুন্তলা অধীর হয়ে কাঁদতে থাকলে আকাশমার্গ থেকে এক তীব্র জ্যোতিপুঞ্জঃ তাঁকে নিয়ে অন্তর্হিত হন এবং তিনি মারীচের আশ্রমে নীত হন। সেখানে কিছুদিন পরে শকুন্তলার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

ওদিকে, শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের পর এক জেলে মাছের পেট থেকে রাজার নাম লেখা আংটিটি পেয়ে যায়—এবং তা রাজার হাতে গিয়ে পৌছায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজার পূর্বস্মৃতি মনে জেগে উঠে—অনুশোচনায় ও দুঃখে তিনি একপ্রকার অবশ হয়ে পড়েন।

কিছুদিন পরে রাজা আবার যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ফেরার পথে মারীচের আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর আবার মিলন হয়। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সপুত্র-পত্নী ফিরে আসেন ও সুখে রাজ্যভোগ করতে থাকেন।

৪॥ 'সীতার বনবাস' প্রসঙ্গে

উৎস ঃ ঈশ্বরচন্দ্র ভবভূতির 'উত্তরচরিত' নাটকের এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অনুসরণে তাঁর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন : রামচন্দ্র-সীতা-লক্ষ্মণ ইত্যাদি চরিত্র-সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর যতখানি মূলের আদর্শ অনুসরণ করেছেন, তার থেকে অনেকখানি তাঁর আপন হৃদয়ের নির্মাণ-কর্মের অন্তর্গত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন : 'রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন।' বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত

গ্রন্থের মধ্যে বহুক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের তীব্র সহানুভূতিশীল কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের এই তীব্র সহানুভূতি তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই লক্ষণ তাঁর সৃষ্ট 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের চরিত্রগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছে।

কাহিনী-সার: চোদ্দ বছর বনবাস যাপনের পর অযোধ্যায় ফিরে এসে রামচন্দ্র রাজা হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। প্রজারা সুখী, রাজ্য সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। কিছুদিন পরে সীতার গর্ভধারণের সংবাদে রামচন্দ্র, কৌশল্যা প্রভৃতির আনন্দের সীমা রইল না। এই সময়ে ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে রাজ-পরিবারের সকলে চলে গেলেন, প্রাসাদে শুধু রইলেন সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

একদিন ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র মুনি রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র জানালেন যে যদি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁকে স্নেহ, দয়া, সুখ, এমন কি সীতাকেও পরিত্যাগ করতে হয়, তাতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না।

সীতার এই শারীরিক অবস্থায় তাঁর মন ও দেহকে সতেজ রাখবার জন্যে লক্ষ্মণ একটা আলেখ্য তৈরী করিয়েছিলেন। তাতে রামচন্দ্রের জন্ম থেকে জানকীর অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত ঘটনাগুলি আঁকা ছিল। সেই আলেখ্য রামচন্দ্র-সীতা প্রভৃতি সকলে মিলে একদিন তাই দেখছিলেন। তার মধ্যে তপোবনের ছবি দেখে সীতার তপোবন দেখবার ইচ্ছে হলো। রামচন্দ্র তখনই লক্ষ্মণকে সীতার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে আয়োজন করতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ চলে গেলে সীতা রামের হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে, রাজ্যের সমস্ত খবরা-খবর আনবার জন্যে রামচন্দ্র দুর্মুখ নামে একজন গুপ্তচরকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেদিন দুর্মুখের মুখে রামচন্দ্র জানতে পারলেন যে অযোধ্যার প্রজারা সীতার নামে নানারকম কুৎসা করে থাকে। তারা রাবণের ঘরে সীতার একাকী থাকার বিষয় নিয়েও কটাক্ষ করতে দ্বিধা করে না। এই খবরে রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথা পেলেন। তবুও অষ্টাবক্র মুনির কাছে যে আশ্বাস-বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তারই মর্যাদা রাখতে তিনি স্থির করলেন যে সীতাকে পরিত্যাগ করবেন। তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন তপোবন দেখাবার নাম করে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসেন এবং জানকী যেন এর কিছুই জানতে না পারেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের

আদেশ মত সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে বিসর্জন দিয়ে এলেন। নির্বাসনের পর, সীতা সব কথা জানতে পেরে দুঃখে-ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়লেন।

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতা আশ্রয় পেলেন এবং যথাসময়ে তিনি লব ও কুশ নামে যমজপুত্র প্রসব করেন। সীতার মাতৃস্নেহের ছায়ায় এবং বাল্মীকির তত্ত্বাবধানে রাজকুমারদ্বয় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলো। পাঁচ বছর বয়সে মহর্ষি তাদের বিদ্যারম্ভ করালেন। বাল্মীকি রামচন্দ্রের অতিমানবীয় চরিত্র নিয়ে রামায়ণ নামে যে অমর কাব্য রচনা করেছিলেন প্রথমে সেই কাব্য লব-কুশকে পড়ালেন এবং মনোহর শিশুকণ্ঠে গান করাতে শেখালেন। শেষে এগার বৎসর বয়সে মহর্ষি কুমারদ্বয়ের উপনয়ন দিলেন এবং তাদের বেদ পড়াতে আরম্ভ করালেন। কিন্তু তারা কে, তাদের পিতা কোথায়, কেন তারা এখানে, এ পর্যন্ত, তার কিছুই লব-কুশ জানে না।

বালকদ্বয়ের বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন যে, কি উপায়ে রামচন্দ্রের কাছে তাঁর এই দুই পুত্রের পরিচয় করানো যায়, এবং নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটানো যায়। ঠিক সেই সময়ে, একদিন সন্ধ্যেবেলায় তিনি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হবার নিমন্ত্রণ পেলেন। বাল্মীকি এই সুযোগের অপেক্ষাই করছিলেন। তিনি তখনই লব-কুশকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললেন। সেখানে কুশ ও লবের মুখে রামায়ণ গান শুনে সকলেই মোহিত হয়ে গেলেন। সেই সুযোগে ঋষিও সভাস্থ সকলের সামনে বালকদ্বয়ের পরিচয় প্রকাশ করলেন এবং সীতা যে তাঁর আশ্রয়ে আছেন তাও জানালেন। এই সংবাদে রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে সীতাকে আনবার জন্যে অযোধ্যা থেকে রথ পাঠিয়ে দিলেন। সীতা ও রামচন্দ্র উভয়েই আসন্ন মিলনের জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন।

সীতা যথা সময়ে রাজসভায় এসে হাজির হলেন। কিন্তু সুখভোগ তাঁর ভাগ্যে আর ছিল না। তাই সভাস্থ সকলে একবাক্যে তাঁকে অকলঙ্ক চরিত্র বলে গ্রহণ করতে রাজী হলো না। কেউ কেউ সভায় সীতাকে তাঁর চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতার প্রমাণ দিতে বললো। এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে সীতার মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়লো। রামচন্দ্র মর্মাহত হলেন। সীতা রাগে, দুঃখে, অভিমানে, নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট সহ্য করতে পরাঙ্মুখ হয়ে, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর জ্ঞান আর ফিরে এলো না। লব-কুশ, রামচন্দ্র-কৌশল্যা সকলেই হায় হায় করতে লাগলো।

৫। গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর ও কয়েকটি বিশিষ্ট মত :

ক. "…রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।"

"…এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্রের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।"

"…সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয় কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী-লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা

ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী-লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।"

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র']।

খ. "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে—যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব-সভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানব জীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা-যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

"বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।

তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।"

[রবীন্দ্রনাথ : চারিত্রপূজা : 'বিদ্যাসাগরচরিত' : পৃ. ৯-১১]

গ. "তিনি যে কেবল বাংলা গদ্যের আবিষ্কর্তা নহেন, পরন্তু তাঁহার রচনা যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সর্বগুণান্বিত ক্লাসিক,—'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হইতে আত্মজীবনচরিত পর্যন্ত পাঠ করিলে প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে। এই গ্রন্থের পাতাগুলি একটির পর একটি উল্টাইয়া পড়িবার কালে যে রস আস্বাদন করিলাম, ইহার ভাষায় যে একটি মৃদু-মধুর কস্তুরী-সৌরভ অনুভব করিলাম, ইহার বাক্যগুলিতে এমন একটি নির্মল প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধগম্ভীর মাধুর্য আছে, যাহা বাংলা গদ্যের আজিকার এই বিকাশের পরেও একটি বিশিষ্ট ও দুর্লভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। মনে হইল, এতদিন পরে একটি বস্তুর প্রকৃত পরিচয় পাইলাম, যে বস্তু—বাংলা গদ্যসাহিত্যের—রোমান্টিক নয়, খাঁটি ক্লাসিক্যাল রীতি; এ বস্তু যদি না থাকিত, তবে বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অভাব থাকিয়া যাইত।

"মধুসূদন দত্ত কান ও প্রাণের যে সাধনায় বাংলা অমিত্রচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও আর একপথে তেমনই সাধনার ফলে এই গদ্যচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যের ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুকীর্তির অশেষ নিদর্শন নির্মাণ করিয়াছেন।

" ... 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং তাহার পরেই 'শকুন্তলা'য় আমরা ভাষার যে রূপ দেখিতে পাই তাহা বাংলারই সাধুরূপ—যেমন বিশুদ্ধ তেমনই প্রাঞ্জল। শকুন্তলায় কথোপকথনের ভাষা—বিশেষতঃ নারী-চরিত্রগুলির—একেবারে খাঁটি বাংলা বলিলেই হয়। কিন্তু 'সীতার বনবাসে' দেখিতেছি, ভাষায় সে লঘুলীলা আর নাই। সে ভাষা শুধুই সাধু-নয়, গুরু-ভাষা। 'শকুন্তলা'য় কালিদাসের, এবং 'সীতার বনবাসে' ভবভূতির—ভাব ও ভাষার আবহাওয়াই ইহার কারণ নয়, এই দুই রচনার মধ্যে যে আর একটি বৃহত্তর রচনার ব্যবধান রহিয়াছে তাহাই ইহার কারণ। এই রচনা মহাভারতের অনুবাদ; এবং ইহাই এই খণ্ডের বৃহত্তম রচনা। ইহার পূর্বের দুইখানি গ্রন্থে তিনি যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, এখানে তাহা করিতে পারেন নাই। মূলের ভঙ্গি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি পদবিন্যাসে সংস্কৃতের রীতি স্বীকার

করিয়াছেন ; ইহার ফলে, মহাভারতের ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।" [মোহিতলাল মজুমদার : 'সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর' : সাহিত্যবিতান, পৃ. ৩১—৩৫]।

ঘ. বাঙলা সাধুভাষার গদ্যভঙ্গিকে পূর্ণ সমর্থ করিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।...বাঙলা গদ্য জড়তা ও দুর্বোধ্যতা হইতে মুক্তি পাইয়া সাহিত্যের আটপহরিয়া ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করিল।

পূর্ববর্তী গদ্যভঙ্গিতে বিভিন্ন ধরণের একাধিক বাক্য-সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা গ্রথিত হইত। সুতরাং ভাবের বিরুদ্ধতার এবং ব ক্যের ভারসাম্যহীনতার জন্য রচনা নিতান্ত কর্কশ এবং লালিত্যহীন হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির লেখায় বাক্যের ভারসাম্যহীনতা কাটিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর আনিলেন লালিত্য ও নমনীয়তা। উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যলেখকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের বিশিষ্ট চাল বা তালটি (rhythm) ধরিতে পারিয়াছিলেন। পদ্যের মতো গদ্যেরও একটা নিজস্ব ছন্দ অর্থাৎ তাল আছে। বাক্যাংশের অর্থ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসবায়ু মন্দীভূত হইয়া আসে, এবং তখনই গদ্যের তালে যতি পড়ে। প্রত্যেক ভাষায় গদ্যের যতির রূপ বিভিন্ন। বাঙ্গালা গদ্যের নিজস্ব যতি অনুসারে বিদ্যাসাগর সাহিত্যের ভাষায় সজ্ঞান ভাবে সুষম বাক্যগঠনরীতি প্রবর্তন করিলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখকদিগের রচনায় সুষম বাক্যগঠনরীতির পরিচয় যে মেলে না তাহা নয়, কিন্তু সে লেখকরা তাহাতে সজ্ঞান বা সাবহিত ছিলেন না।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (চতুর্থ সং)

ঙ. "রামমোহন বাংলা গদ্যকে পরিণতির যে স্তরে লইয়া গিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিত বোধ ও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া উহাকে পরিণতির এক উচ্চতর পর্যায়ে স্থাপিত করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার হাতেই গদ্যভাষা কৈশোরের অনিশ্চয়তা ও অস্থির গতি ছাড়াইয়া পূর্ণ সাহিত্যিক রূপের স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। গদ্যের কাঠামো ও বাক্যের ভারসাম্য ও অন্তশ্ছন্দ-স্থিরীকরণে তাঁহারই প্রভাব যে সর্বাধিক তাহা নিঃসন্দেহ। বাংলা গদ্যের জনককে ইহা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে নানারূপ মতবাদ দেখা দিয়াছে। অবশ্য সন্তানের পিতৃত্ব নিরূপণের ন্যায় ভাষার পিতৃত্ব-নিরূপণ নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কথ্যভাষার জন্ম লোকমুখে ; সাহিত্যিক ভাষা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বহু জননীর স্তন্যপানে, বহু ধাত্রীর লালন-পালনে, বহু

শিশু তাহার স্বতন্ত্র অভিভাবকত্বে বাড়িয়া উঠে, সুতরাং ভাষা সম্বন্ধে একজনকত্ব অপেক্ষা বহুমাতৃকত্বই অধিকতর প্রযোজ্য। মৃত্যুঞ্জয় এই নবজাত ভাষাশিশুকে সূতিকাগৃহে স্তন্য দিয়াছিলেন; রামমোহন ইহাকে কৈশোর-ক্রীড়ার ক্ষেত্রে আপন নৈপুণ্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে শিখাইয়াছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র ইহাকে পূর্ণ যৌবনের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের বিচিত্র কর্তব্য পালনের উপযোগী দীক্ষায় অভিষিক্ত করিয়াছেন।

"...তাঁহার সাহিত্যরচনা শিল্পচেতনা অপেক্ষা প্রবলতর সমাজবোধের দ্বারাই বেশী প্রবাহিত। তিনি শিক্ষক ও সমাজ-সেবীর ভূমিকা হইতেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যের বহিরঙ্গের সুষমা ও অন্তরের লাবণ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে তিনি মূলের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভাব পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন ও ভাষাকে যেরূপ নিপুণতার সহিত ভাবের অনুগামী করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিল্পজ্ঞান ও সমকালীন সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শকুন্তলা ও সীতা তাঁহার হাতে যেন আমাদের পরিবার জীবনের স্নেহ-মমতা-লজ্জা-অভিমান প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তির অধিকারিণী বাঙালী নারীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

[শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলা সাহিত্যে বিকাশের ধারা।'
বাংলা গদ্যের অনুশীলন, পৃ. ১৮-১৯ (৩য় সং)]

চ. "...বিদ্যাসাগরই বোধ করি একমাত্র শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক বিশুদ্ধ শিল্পপ্রেরণায় যিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার রচিত সাহিত্য তাঁহার ধর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। কর্মের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আদৌ তিনি লেখনী ধারণ করিতেন কি না সন্দেহ। প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী গ্রহণ করেন। ... নব্য বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনই বোধ করি প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রেরণায় যাঁহার কলম চলিয়াছে। তৎপূর্বে সমস্ত সাহিত্যিকেরই লেখনীধারণের মূলে ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর সকলেই এই নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে-কলম সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কখন, আপনার অগোচরে উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া গেল—এবং বাংলা গদ্যের স্থায়ী নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ গড়িয়া তুলিল। বিদ্যাসাগরের গদ্যের সঙ্গে

পূর্ববর্তীদের গদ্যের প্রভেদটা কোথায় এবং কিসে, তাহা বোঝা সহজ, বোঝানোটাই কঠিন।

"…ছন্দের প্রাণ যতিতে অর্থাৎ যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যে—এই নিয়ম গদ্য ও পদ্য দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যতিস্থাপনের সার্থকতাতেই মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর আশ্চর্য সৃষ্টি, বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যলেখকগণ সজ্ঞানে যতিস্থাপনের নিয়ম অনুসরণ করেন নাই—আঁচে আন্দাজে বা অন্ধভাবে চলিয়াছেন, কখনো কখনো তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে, অধিকাংশ সময়ই করে নাই। বিদ্যাসাগরই প্রথম সজ্ঞানে শিল্পবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া নিয়মটিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার পক্ষে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল; কেবল পূর্ণচ্ছেদে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। প্রভাবতী-সম্ভাষণের ভাষা হৃদয়াবেগে মন্থর, অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত, পদে পদে কমা সেমিকোলনে ঈষৎ থামিয়া থামিয়া চলিয়াছে। ব্রজবিলাস ও তজ্জাতীয় বিতণ্ডা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ভাষা কেমন টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটিয়াছে, চার পায়ের আঘাতে গ্রাম্য শব্দের লোষ্ট্রখণ্ড ছুটিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে আহত করিয়াছে। আর সীতার বনবাসের ভাষায় ঐরাবতের গজেন্দ্রগমন। পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে ঐ ভাষাই অত্যাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছিবার আগে ভাষার এমন বিচিত্র গতিচ্ছন্দ আর পাওয়া যাইবে না। সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ছন্দে নব্য গদ্যরীতির মূল ছন্দ ধ্বনিত। সেই ছন্দই নানা কলমে বিচিত্রতর হইয়া আজ পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে। পদ্যে মধুসূদন যাহা করিয়াছেন, গদ্যে তাহা করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যছন্দের মধুসূদন।

"…সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যাসাগর চরিত্রের রাজসিকরূপ প্রকাশিত। এখানে সত্যই তিনি ঈশ্বর। ধন বলিতে কেবল রজতখণ্ড বা স্বর্ণখণ্ড বুঝায় না। আসল টাঁকশাল মনের মধ্যে—যেখানে নিরন্তর যে ধাতুর চক্র মুদ্রিত হইতেছে মানুষের কর্মে তাহার প্রকাশ। কাহারো কর্ম তাম্রচক্র, কাহারো রৌপ্যচক্র, কাহারো স্বর্ণচক্র; বিদ্যাসাগরের কর্ম বিধাতার মুদ্রা-অঙ্কিত স্বর্ণচক্র; সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি সেই কর্মের অন্তর্গত।

"…নিছক সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণায় তিনি আত্মচরিত লিখিতে বসিয়াছিলেন, খুব সম্ভব সেইজন্যই শেষ করিতে উদ্যম বোধ করেন নাই।

এদিকের বিচারে বসিলে দেখা যাইবে যে বাংলা দেশের এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গতানুগতিক অর্থে মোটেই সাহিত্যিক ছিলেন না।"

[প্রমথনাথ বিশি : বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার : পৃ. ॥৶৹ হইতে ১/৹]।

ছ. " ··· শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা এক সঙ্গে পরপর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার জড়ানো এক অপরিচিত শব্দ সঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

"বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে :

'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি·········

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু কে জানে তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয় সেই যে বছর দুই আগে······

"শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর-আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।" [বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পথের পাঁচালী']

*